দাম : ষোলো টাকা

শ্রীগুরুপূর্ণিমা উৎসব ও সমর্পণ এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ— পৃঃ ৩২

স্বস্তিকা

বিচারব্যবস্থার স্বদেশীকরণ সম্পন্ন হলো — পৃঃ ১১

৭৬ বর্ষ, ৪৩ সংখ্যা।। ১৫ জুলাই, ২০২৪।। ৩০ আষাঢ়, ১৪৩১।। যুগাব্দ - ৫১২৬।। website : www.eswastika.com

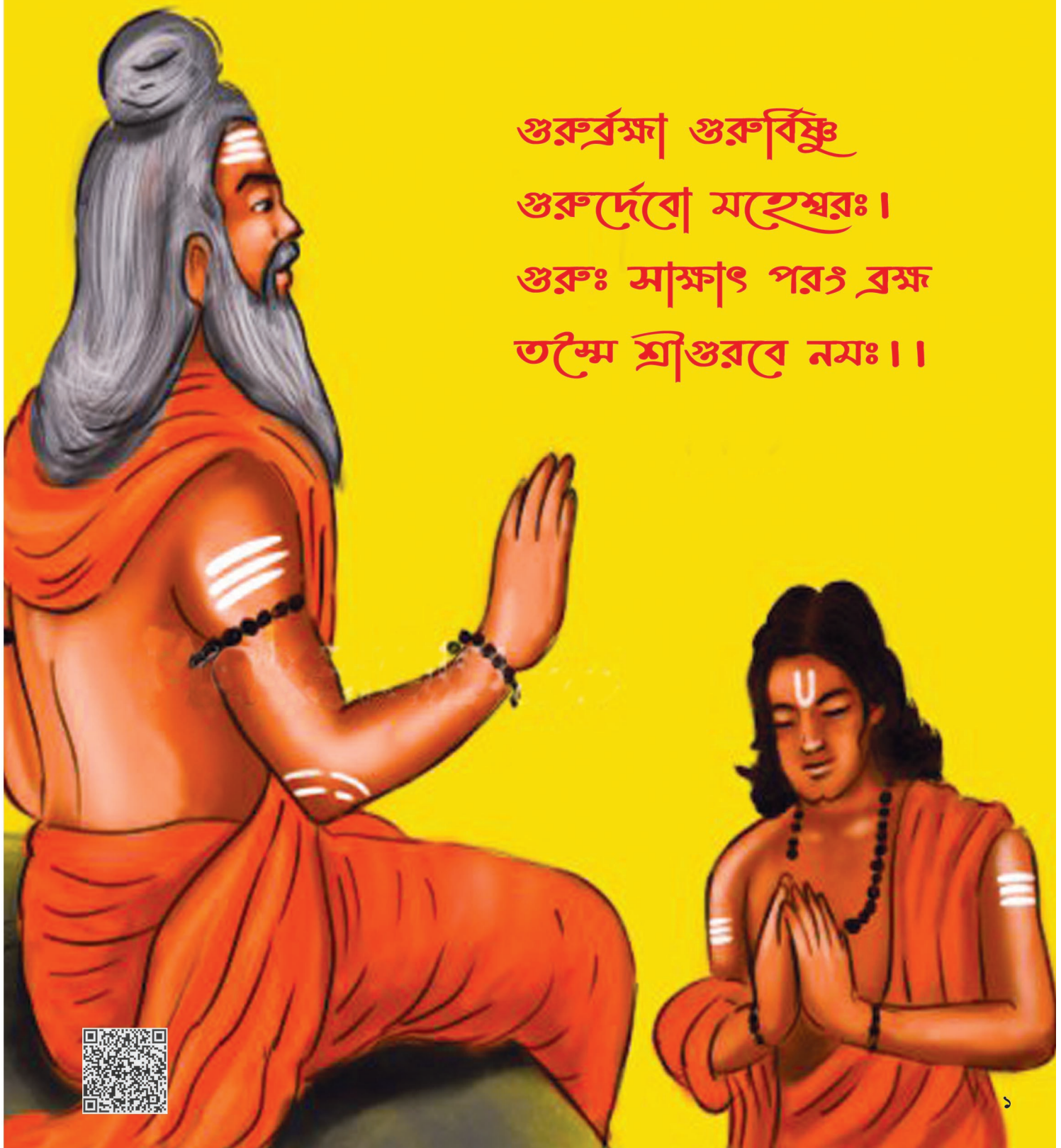

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৬ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা, ৩০ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

১৫ জুলাই - ২০২৪, যুগাব্দ - ৫১২৬,

Website : www.eswastika.com

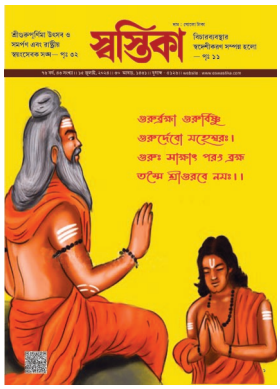

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

তৃণমূলের 'বেঙ্গল লাইন', সিপিএমের 'কেরালা লাইন' চোরে চোরে মাসতুতো ভাই ☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

তৃণমূল আদালতে পিটুনি বিচার ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

বিশ্ববিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবোত্থান ☐ গুঞ্জন আগরওয়াল ☐ ৮

ফিরহাদের মন্তব্য হিন্দুদের বিপদ আরও বাড়াবে ☐ বিশ্বামিত্র ☐ ১০

বিচার ব্যবস্থার স্বদেশীকরণ সম্পন্ন হলো ☐ ধর্মানন্দ দেব ☐ ১১

ভোট পরবর্তী হিংসা এবং তার সমাধান ☐ কর্নেল কুণাল ভট্টাচার্য ☐ ১৩

ভারতীয় ফৌজদারি আইন সংস্কারে মোদী সরকার বিদেশি স্মৃতিচিহ্ন মুছে দিল ☐ আনন্দ মোহন দাস ☐ ১৫

নরেন্দ্র এবং নরেন্দ্রর তিনি কেমন গুরু শিষ্য? ☐ ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ ১৭

গুরু-শিষ্য—রামদাস স্বামী ও ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ ☐ শিবাজী প্রসাদ মণ্ডল ☐ ২৩

গুরু-শিষ্যা সংবাদ ☐ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ☐ ২৪

জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ☐ গোপাল চক্রবর্তী ☐ ৩১

শ্রীগুরুপূর্ণিমা উৎসব এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ☐ রাজদীপ মিশ্র ☐ ৩২

ভারতীয় অধ্যাত্মজীবনে গুরুপূর্ণিমা ও মহানামব্রতজী ☐ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী ☐ ৩৪

গুরু-শিষ্য সংবাদ বালানন্দ ব্রহ্মচারী ও তারানন্দ ব্রহ্মচারী ☐ সুমঙ্গল চট্টোপাধ্যায় ☐ ৩৬

রূপনারায়ণের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ☐ ডাঃ কনক চৌধুরী ☐ ৪৩

বালক-বুদ্ধি ☐ অজয় ভট্টাচার্য ☐ ৪৬

গুরু-শিষ্য— স্বামী অখণ্ডানন্দ ও শ্রীগুরুজী ☐ তানিয়া বেরা ☐ ৪৭

নিয়মিত বিভাগ :

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ☐ অঙ্গনা : ২১ ☐ সুস্বাস্থ্য : ২২ ☐ সমাবেশ সমাচার : ২৬-৩০ ☐ খেলা : ৩৮ ☐ অন্যরকম : ৩৯ ☐ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ☐ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৮-৫০

প্রকাশিত হবে
২২ জুলাই,
২০২৪

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২২ জুলাই,
২০২৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

সর্পদেবী মা মনসা

ভারতীয় সংস্কৃতি অনুসারে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষাকারী প্রত্যেকটি প্রাণীকে সমান গুরুত্ব দিয়ে যুগ যুগ ধরে পূজা করে সংরক্ষণের বার্তা দেওয়া হয়েছে। সেই দৃষ্টিতে ভয়ংকর সর্পপূজারও রীতি সমগ্র ভারতে প্রচলিত। বাংলা সাহিত্যে সর্পদেবী মনসাকে নিয়ে কাব্যও রচিত হয়েছে।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয়ের ওপর আলোকপাত করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট গবেষক ও লেখক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

গুরুপূর্ণিমা তিথি থাকিতে পৃথক শিক্ষক দিবসের প্রয়োজনীয়তা কী?

'গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ। গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।' জ্ঞান সমুদ্রের সমস্ত স্রোত গুরু হইতেই নামিয়া আসিয়াছে। তিনিই সব হইয়াছেন। তিনিই চৈতন্যস্বরূপ। উপনিষদে রহিয়াছে 'সোঽহম্', 'আমি' দ্বিবিধ। প্রত্যক্ষ আমি বা 'অহং'; যাকে বলিতে পারি 'একা আমি'; 'স্বার্থগত আমি'; 'কাঁচা আমি'; 'ছোট আমি'। আর এক 'আমি' হইতেছেন 'অপ্রত্যক্ষ আমি' বা 'ভূমা'; তিনি 'বড়ো আমি'; 'আমার' এই নিত্য পথ পরিক্রমায় কে দেখাইবেন পথ? আমার গুরু, যিনি আমার জীবনচর্যা ও মানসচর্চার যথার্থ ও সমন্বিত শিক্ষক। আমার মধ্যেই যাবতীয় ব্রহ্মসত্তা রহিয়াছে; তা রহিয়াছে সুপ্তিতে। গুরু বা শিক্ষক হইবেন একজন 'উশকো কাঠি'। শাস্ত্রে দেখিতে পাই 'ব্রহ্ম বিহার' করিবার কথা। ছোটো আমির মধ্যে বড়ো আমির প্রকাশ মধুর করিবার কথা। ইহাই ব্রহ্ম বিহার। আপনার মধ্যে অপরের জন্য অনুক্ষণ মৈত্রী পোষণ করা। শিক্ষক-ছাত্রের ক্ষেত্রে উহা কি হইবে? শিক্ষক-শিক্ষকে কি হইবে? ছাত্রে-ছাত্রে কি হইবে? উপনিষদে দেখিতে পাই— 'ওঁ সহনাববতু সহনৌভুনক্তু সহবীর্যং করবাবহৈ তেজস্বীনাবধিতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ। ওঁ শান্তি শান্তি শান্তিঃ।' আমরা শিক্ষক-ছাত্র সমভাবে বিদ্যার্জন করিব; সমভাবে বিদ্যার ফল লাভ করিব; সকলে সুস্থ-সবল নীরোগ জীবনযাপন করিব; কেহ কাহারও প্রতি বিদ্বেষ করিব না; আমাদের মধ্যে সকল শান্তি বিরাজিত হউক।

বিদ্যালয় ও সারস্বত প্রতিষ্ঠান হইতে পূর্ণ মানুষ হইয়া বাহির হইতে হইবে—নিজেকে অবিরত চিনিয়া, নিজেকে জানিয়া, নিজের চিন্তা চেতনাকে উপলব্ধি করিয়াই পূর্ণ মানুষ হওয়া যায়। যিনি পূর্ণ মানুষ, তিনি এক অর্থে বিজ্ঞানীও বটে। কারণ তিনি ঘটনাবলীকে আপনার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়া বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন। বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, সংস্কৃতবান ব্যক্তি কাহারও চিন্তা অপহরণ করিয়া বৃহৎ হইতে পারেন না। স্বাধীন চিন্তার উদয় না হইলে সমাজ, রাজ-অঙ্গন ও জ্ঞান-বিজ্ঞান পরিপুষ্ট হইবে না। সেই পথে গুরুদেব আমাদের সহায় হইবেন। তাই গুরুর আদর্শ বিচ্যুত হইলে চলিবে না। পূর্ণ মানুষই যথার্থ মানুষ, তাহারা স্বশিক্ষিত মানুষও বটে। আর মনুষ্যত্ব লাভই শিক্ষার উদ্দেশ্য। ব্যক্তি-মানুষের উর্ধ্বে, সমাজ বা রাষ্ট্রই হইল সেইক্ষেত্রে আরাধ্য দেবতা। 'শিখপন্থা-য় 'গ্রন্থসাহিব' নামক পবিত্রগ্রন্থ 'গুরুপদবাচ্য' হইয়াছেন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ পরম পবিত্র গৈরিকধ্বজকে গুরু হিসাবে বরণ করিয়াছে। গুরুপূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে জ্ঞান-ত্যাগ-সংযম-পরাক্রমাদি, বিবিধ শুভঙ্করী গুণের প্রতীক পরম পবিত্র গৈরিক ধ্বজে পরম শ্রদ্ধায় গুরুর আসন পাতিয়া আত্মসমর্পণের ভাবগাম্ভীর্য বহন করিতেছেন লক্ষ লক্ষ স্বয়ংসেবক। গুরুপূর্ণিমার দিনে এই গৈরিক ধ্বজে আপন অন্তরের যাবতীয় মণিমাণিক্য লইয়া সম্পূর্ণভাবে সমর্পণই হইল তাহাদিগের শ্রেষ্ঠ গুরুদক্ষিণা। এখন প্রশ্ন হইতেছে, গুরু পূর্ণিমার মতো তিথি কয়েক হাজার বৎসর ধরিয়া প্রচলিত হওয়া সত্ত্বেও পৃথকভাবে 'শিক্ষক দিবস'-এর প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে কি?

মনের সুপ্তি পূর্ণতা পাইয়া যে স্ফুলিঙ্গ আসিয়া সহসা আমাতে পড়ে, যিনি দীপ প্রজ্বলন করেন আমার হৃদয়-মন্দিরে, যাঁহার স্নেহ বারি-রাশি আমাতে ঝরিয়া পড়ে, তিনিই আমার গুরু। যখন রাষ্ট্রধর্মের প্রতি আমার এমত বোধ জন্মিবে, তখন গৈরিক ধ্বজ হইয়া উঠিবেন আমার গুরু। গুরু হইতে নামিয়া আসেন দেবমণ্ডলী, সমবেত সৌকর্যে এবং ঐশী পরিবেশে তিনি হইয়া উঠিবেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। জ্ঞান সাগরের মহাবাণীও তিনি আনিয়া দিবেন। গুরুর নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের বিদ্বেষ-বিষ দূর করেন, আমরা যেন সমভাবে শিক্ষা অর্জন করিতে পারি, নীরোগ দেহে যম-লিখন কাড়িয়া লইতে পারি, শান্তি-সুখে দূর করতে পারি আপন মনের ক্ষত। তিনি সুন্দর, তিনি আমাদের জীবন গড়েন। তাই আমরা নিজেরাই নিজেদের চিনিতে পারি, চেতনা মিলিয়া মোক্ষপথের মুক্তি-ডালা পূর্ণ করিতে পারি। সাগর সেঁচিয়া যে মণি-মাণিক্য খুঁজিয়া পাইয়াছি, তাহা যেন জীবনের প্রয়োজনে নিয়োজিত হয়, জীবনের রোগ, দুঃখ, বেদনার সমাধান আনিয়া দেয়। জীবনের সুর বাঁধা রহিয়াছে যে ঐকতানে, সেই জীবনপথের রথযাত্রায় চরৈবেতিও তিনি শিখাইবেন, মন-রথে যেন আমরা 'অসুর' না হইয়া পড়ি তাহা দেখিবেন, আমাদের সংগীত মিলিয়া যাইবে পরমারাধ্য গুরুদেব বা গৈরিকধ্বজের মঙ্গল সংগীতে। তবেই আমরা ব্রহ্মবিদ হইতে পারিব।

সুভাষিতম্

যেষাং ন বিদ্যা ন তপো ন দানং জ্ঞানং ন শীলং ন গুণো ন ধর্মঃ।

তে মর্ত্যালোকে ভুরিবারভূতা মনুষ্যরূপেণ মৃগাশ্বরনি।। (চাণক্য নীতি)

যাদের বিদ্যা নেই, সাধনা নেই, দান নেই, জ্ঞান নেই, চরিত্র নেই, গুণ নেই, ধর্ম নেই—তারা মনুষ্যকুলে পৃথিবীর বোঝাস্বরূপ। তারা মনুষ্যরূপে পশুর মতো কেবলই বিচরণ করে থাকে।

তৃণমূলের ‘বেঙ্গল লাইন’, সিপিএমের ‘কেরল লাইন’

‘চোরে চোরে মাসতুতো ভাই’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

বিদেশি সিপিএমের জমানায় গণপিটুনিকে গণরোষ বলে চালানো হতো। উত্তর ২৪ পরগনার এক সিপিএম নেতা দাঁড়িয়ে থেকে একজনকে পিটিয়ে মারিয়েছিল। তার জেল হয়। ভালো সাজতে জেলে সে কীর্তন গাইতো আর বলতো ‘পার্টি কী বলছে’। কচি সিপিএমরা এসব জানে না। সিপিএমের এক মন্ত্রী দাঁড়িয়ে থেকে মানুষ মারিয়ে মাটির নীচে মৃতদেহ পুঁতিয়েছিল। প্রমাণের অভাবে সে আর তার সঙ্গীরা ছাড় পেয়ে যায়। বিজেপির এক নেতা বলেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিপিএমের খুব ভালো ছাত্রী। বিদেশিদের জমানার শেষ দিকে এখানে জঙ্গলরাজ চলত। মমতা জমানায়ও তাই চলছে। তা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। তৃণমূল না সরলে সে কাঠামো আর ব্যবস্থাপনা ভাঙা প্রায় অসম্ভব।

সবচাইতে হাস্যকর যিনি এই সবের মাথা বলে অভিযোগ সেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন নিজেই ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন। বাঘের পিঠে চড়লে নামা যায় না। শহর আর শহরতলির লোকসভা ভোটের ফল তাঁর হৃদ্‌কম্পন ধরিয়ে দিয়েছে। শহরের ভোটার সরকারি সাহায্যের মুখাপেক্ষী নন। তাই ভাতার খেলা কাজ করেনি। গ্রামাঞ্চলের মহিলা আর মুসলমান ভোট মমতার বুনিয়াদ। হুমকি, ভয় আর মিথ্যা দাবড়ানি দিয়ে তৃণমূল তাদের ভোট হাসিল করেছে। স্তাবকেরা মিথ্যা রটিয়েছে বিজেপি জিতলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার-সহ সব সরকারি ভাতা বন্ধ হয়ে যাবে। গ্রামের মানুষকে ভয় না দেখালে তৃণমূল হেরে যাবে। গ্রামাঞ্চলের দুর্নীতি আর জঙ্গল রাজত্ব নিয়ে মমতা একটি শব্দও খরচ করেন না। মুসলমান হলে তো একেবারেই ‘স্পিক-টি-নট’ মমতা। সমালোচনা কেবল শহর আর শহরতলি যেখানে তিনি ধাক্কা খেয়েছেন।

চোপড়া থেকে শুরু করে রাজ্যের সর্বত্র মনুষ্যেতরেরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ওই সব পশুদের নাম লিখলে ‘স্বস্তিকা’ পত্রিকার অসম্মান হবে। ২০২৬-এর রাজ্য ভোটে তৃণমূলের ‘হার্ট অ্যাটাক’ হতে পারে এরকম সম্ভাবনা রয়েছে। এক অবস্থা কেরালায় বিদেশি দল সিপিএমের। সেখানে ২০২৬-এ ভোট। আর এখানেও। একগাদা দুর্নীতি আর তহবিল তছরুপের অভিযোগে কেরালায় সিপিএমের বেহাল দশা। আগেই লিখেছি সিপিএম-তৃণমূল এক গাছে দুই ফুল। এখন চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। একটি বাউল গানের কলি একটু আলাদাভাবে মেলালে ‘চোরের গায়ে চোর লেগেছে আমরা ভেবে করব কী?’ রাজ্যের ৪২টি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে ২৫ কেন্দ্রে মহিলা ভোটার বেশি। তৃণমূল ১৫ আর বিজেপি ১০টি কেন্দ্র জিতেছে। সেখানে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কাজ করেনি। তাও মমতা এগিয়ে কেন?

পর্যালোচনা করে বিদেশি সিপিএম একটি লজ্জার উত্তর দিয়েছে যে তাদের ভোটাররাই

> **“মমতার আর কেরালা রাজ্যে এখন একটাই আদর্শ চুরি আর দুর্নীতি। দু’রাজ্যের শাসকের অদ্ভুত মিল। দু’জনের বিরুদ্ধেই চুরি আর তছরুপের অভিযোগ রয়েছে।”**

বিশ্বাসঘাতকতা করে মমতাকে ১৪ আসনে জিতিয়েছে। একেই বলে চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। বিধানসভা ভোটের নিরিখে তৃণমূলের ভোট ২ শতাংশ কমেছে আর বিজেপির প্রায় ১ শতাংশ বেড়েছে। সিপিএম ২৩ আসনের মধ্যে ২১টিতে জমানত হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মমতাকে বাঁচিয়েছে। একটা সময় বিদেশি সিপিএমে ‘বেঙ্গল লাইন’ বনাম ‘কেরালা লাইন-এর তাত্ত্বিক লড়াই চলত। মাপা হতো কোন রাজ্যের পাল্লা ভারি। ‘পালিত ব্যুরো’তে (পড়ুন পলিটব্যুরো) পাশ করলেও কেন্দ্রীয় কমিটি জ্যোতি বসুকে প্রধানমন্ত্রীর দৌড়ে ফেল করিয়ে দেয়। তেরো বছর আগে এই রাজ্য থেকে বামেরা উবে যায়। সব বেলাইন হয়ে যায়।

২০১৮-তে ত্রিপুরাতেও গ্যাস বাতি নিভে যায়। এখন শিব রাত্রির সলতে ‘কেরল’। মমতার আর কেরালা রাজ্যে এখন একটাই আদর্শ চুরি আর দুর্নীতি। ২০২৬-এ দু’ই রাজ্যে নির্বাচন। দু’রাজ্যের শাসকের অদ্ভুত মিল। দু’জনের বিরুদ্ধেই চুরি আর তছরুপের অভিযোগ রয়েছে। তৃণমূলের ২৩ নেতা জেলে। আর ইডি কেরালায় সিপিএমের ত্রিশূর ব্যাংকে ৭৩ লক্ষ টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। সমবায়ের অর্থ তছরুপের অভিযোগ রয়েছে অনেক নেতার বিরুদ্ধে। মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের কন্যা বীণা বিজয়নের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে। গত তিন বছরে প্রায় ১০ শতাংশ ভোট কমেছে কেরালায় সিপিএমের। ২০২৬-এর রাজ্য ভোটে যে তাদের শেষ রক্ষা হবে না তা অনেকেই বলতে শুরু করেছেন। মমতার ক্ষেত্রেও তাই। সাদা কাপড়ে কাদার ছিটে আপাতত খানিকটা সামলানো গেলেও নীল দিয়ে তা ঢেকে দেওয়া যাবে না। ২০২৬-এ তার উত্তর দেবেই। □

তৃণমূল আদালতে পিটুনি বিচার

বিচারকেষু দিদি,

আপনার দলের বিচারপ্রক্রিয়া ভারী সুন্দর। কেউ কিছু করলেই প্রথমে তাঁর সঙ্গে দলের দূরত্ব রচনা করা হয়। এর পরে কিছুদিন বিতর্ক থিতিয়ে গেলে তাঁকে আবার দলের কাজে টেনে নেওয়া যায়। দুর্নীতির দায়ে জেলে চলে গেলেও তৃণমূলের বিচারে তাঁকে দলে, বিধায়ক পদে, এমনকী মন্ত্রীও রেখে দেওয়া যায়। আসলে তৃণমূলে আপনি যে সংস্কৃতি তৈরি করেছেন তাতে এক জনই বিচারক। আপনি একাই ঠিক করেন কোনটা অপরাধ, কোনটা নয়। কাকে কী সাজা এবং কত দিনের জন্য দিতে হবে সবই আপনি ঠিক করেন।

তবে দিদি, আপনি কিন্তু সব জায়গায় বিচারক বা শাস্তিদাতা নন। স্থান ভেদে সেই জায়গার প্রধানরা দলের তো বটেই সাধারণের বিচার করতে পারেন। ধোপা নাপিত বন্ধ করা তো বটেই নিজে হাতে সাজাও দিতে জানেন। আমি যখন এই চিঠি লিখছি তখন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে সালিশি সভার নামে তৃণমূল আদালতের বিচারের বাণী শোনা যাচ্ছে। বেধড়ক পিটুনিই যেখানে সাজা।

চোপড়ার বাহুবলী তাজিমুল ওরফে জেসিবিকে নিয়ে বেশি আলোচনা। কিন্তু দিদি, আপনার মতো আমিও জানি, পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে ব্যতিক্রমী চরিত্র নয় তাজিমুল। পশ্চিমবঙ্গের আনাচকানাচে এমন অনেক জেসিবি বেড়ে উঠেছে। তারা এক সময়ে সিপিএমের ছিল, এখন আপনার অনুচর হয়েছে। তবে উত্তর দিনাজপুরের ঘটনায় উঠে এসেছে তৃণমূল বিধায়ক হামিদুল রহমানের নামও। আপনার দল তাকে শো-কজ করেছে। আপনার এই বিধায়কও কি আদৌ ব্যতিক্রমী? জেসিবির মতো বাহুবলীদের মদত দেয় এমন অনেক নেতাকেই দেখতে পাওয়া যায় তৃণমূলে। সেটা পাড়ায় পাড়ায়। এই মুহূর্তে তারা সংবাদ শিরোনামে নেই, ফারাক এটুকুই। কিন্তু সকলেই জানেন, চেনন। তাদের ভয়ও পান। রাজনৈতিক নেতার মদতে তারা নিজেদের এলাকায় দাপিয়ে বেড়ান। পুলিশ তার হরেক অন্যায় দেখেও দেখতে পায় না। তারাও সম্ভবত ভয় পান।

পশ্চিমবঙ্গের রঙ্গমঞ্চে শুধুই কুনাট্যের নিরন্তর অভিনয় চলছে। প্রশ্ন হলো, কেন? আসলে শাসক দলের যে নেতার দখলে যেটুকু জায়গা রয়েছে, সেখান থেকে খাজনা আদায় করাই নীতি। আর ক্ষমতাশালীর বিচারে ক্ষমা থাকে না। তার কাছে ক্ষমা মানে দুর্বলতা। নপুংশকতা। খাজনা তুলতে ওই নেতারা যেমন অঞ্চলের অর্থনৈতিক সম্পদের উপর নিরঙ্কুশ দখল রাখে, তেমনই ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে রাখে। জমি, ভেড়ি সব তাদের হতে হবে। না হলেও নিয়মিত উপঢৌকন দিয়ে যেতে হবে।

একটা সময় পর্যন্ত জমিদারদের লেঠেল বাহিনী থাকত। সেটাই মেনে চলে আজকের শাসক দলের রাজনৈতিক বাহুবলীরা। সেই সব লেঠেলের মাথায় নেতার হাত থেকে, ফলে তারা আইনের উর্ধ্বে। পুলিশ, প্রশাসনও এই কথা মেনে চলে। একেবারে পাড়ার নেতার সামনেও শিরদাঁড়া নুইয়ে রাখে পুলিশ। আজকাল তো শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়ানোর অভ্যাসটাই নেই। ফলে, জেসিবির অত্যাচারের দৃশ্যটি পুলিশ দেখতে পায়নি। দেখার অভ্যাস নেই বলেই দেখতে পায়নি দিদি। চোপড়ার ঘটনাটি সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে বলেই এত হইচই।

সেটা না হলে, এমনটা তো হয়েই থাকে।

চোপড়ার ঘটনায় আপনি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নড়েচড়ে বসেছেন। সম্ভবত এটা টের পেয়েছেন যে, একদিকে খাজনা আদায় এবং অন্যদিকে ত্রাস রাজ্যের নাগরিকদের মনে বিপুল ক্ষোভের সঞ্চার করছে। বিশেষ করে সেই নাগরিকরা আর আপনার পাশে নেই, যাঁদের জীবনধারণের জন্য সরকারি প্রকল্পের সাহায্যের প্রয়োজন নেই। সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ দেখা গিয়েছে লোকসভা ভোটে।

কিন্তু দিদি, আপনার পক্ষে কি এই পরিস্থিতি পালটানো সম্ভব? গত এক দশকের বেশি সময় ধরে পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতির একটি গণতন্ত্রায়ন ঘটে গিয়েছে। সবাই জানে, শাসক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারলে প্রত্যেকেরই দুর্নীতিতে অধিকার জন্মে। কমপক্ষে হেলমেট না পরে মোটরসাইকেল চালানো যায়। যার যত জোর, সে তত বেশি দুর্নীতি করতে পারে। বাম আমলে দুর্নীতি জোনাল কমিটি-লোকাল কমিটি অর্থাৎ সিপিএমের কাঠামো মেনেই পরিচালিত হতো। কিন্তু এখন আরও বেশি করে 'সবাই রাজা' হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই করে গানের পরের অংশ বেশি দিন বলা যাবে কি? আশঙ্কা হয়, দিদি আর হয়তো আপনার অনুচরেরা 'আমাদের রাজার রাজত্বে' গাইতে পারবে না। □

সবাই জানে, শাসক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারলে প্রত্যেকেরই দুর্নীতিতে অধিকার জন্মে। কমপক্ষে হেলমেট না পরে মোটরসাইকেল চালানো যায়। যার যত জোর, সে তত বেশি দুর্নীতি করতে পারে।

বিশ্ববিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবোত্থান

ভারতীয় শিক্ষা প্রণালীর নবোন্মেষ এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতীয় গরিমার পুনরুত্থানের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হলো বিশ্বখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবরূপে আবির্ভাব। একদা বিশ্ব প্রসিদ্ধ এই শিক্ষাঙ্গনের নবোত্থানের মধ্যে দিয়ে সূচিত হয়েছে এই ঐতিহাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবান্বিত অতীত অবস্থান পুনরুদ্ধারের প্রয়াস। নবরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশ-বিদেশের ছাত্র-ছাত্রীদের পঠনপাঠন, তাদের দ্বারা বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন এবং পরম্পরাগত ভারতীয় জ্ঞানচর্চার লক্ষ্যে ভারত সরকারের দ্বারা এই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে পুনঃস্থাপনার প্রয়াস শেষ পর্যন্ত সার্থক হয়েছে। 'অগ্নি সংযোগের মধ্য দিয়ে পুস্তক জ্বালিয়ে দেওয়া গেলেও পুস্তক নিঃসৃত যে শিক্ষা আমাদের মধ্যে জ্ঞান সঞ্চারিত করেছে তাকে পুড়িয়ে ধ্বংস করা কখনই সম্ভব নয়। নালন্দার ধ্বংস ভারতকে গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত করেছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনঃস্থাপনা শিক্ষায় ভারতের স্বর্ণযুগের সূচনা করবে। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের সন্নিকটে নালন্দার এই নবজারগণ, তার এই নতুন শিক্ষাঙ্গন সমগ্র বিশ্বের সামনে শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতের উজ্জ্বল অবস্থানের পরিচয়বাহী। যে রাষ্ট্র মানবিকতাবোধের শক্তিশালী ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত, উন্নততর ভবিষ্যতের লক্ষ্যে সেই রাষ্ট্রটিই ইতিহাসকে পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম— নবরূপে প্রতিষ্ঠিত নালন্দা হলো এই সত্যেরই পরিচয়বাহী'। গত ১৯ জুন পাটনা থেকে ৯০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বহু শতাব্দী প্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন করে এই কথাগুলি বলেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রাচীন ভারতের গৌরবশালী অতীতের পুনরুদ্ধার হলো ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্য। ভারত থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য বিদেশযাত্রা করে চলেছে। প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন হলো শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে একদিন বিশ্ব জুড়ে শিক্ষার্থীদের গন্তব্য হয়ে উঠবে ভারত।

শিক্ষাক্ষেত্রে সারা বিশ্বের মাঝে নালন্দা মহাবিহারের স্থান ছিল সর্বোচ্চ। এই তথ্য হলো একটি ঐতিহাসিক সত্য। ভারতীয় পরম্পরা এবং প্রাচীন শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রের সারা বিশ্বের গবেষক ও ছাত্রদের কাছে নতুন দিক উন্মোচনের ক্ষেত্রে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মাণ এবং ভারতীয় শিক্ষা সংস্কৃতির পুনঃস্থাপন হলো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বহিঃশত্রুদের দ্বারা একাধিকবার নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর আক্রমণ নেমে এসেছে এবং ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু তারপরেও সেটিকে সংস্কার করা হয়। শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা হতো।

বিহারের রাজধানী পাটনা থেকে নব্বই কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে বড়াগাঁও নামক স্থানে এক সুবিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে গড়ে উঠেছিল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। লাল পাথরের তৈরি এই বিশ্ববিদ্যালয়কে দেখলে এক বিশাল দুর্গ মনে হতো। সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসর এতটাই বড়ো ছিল যে সেখানে একসঙ্গে দশ হাজার ছাত্র আবাসিকভাবে থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতো। শিক্ষকের সংখ্যা ছিল পনেরো শ'। তেইশ হেক্টর বিস্তৃত এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ২০১৬ সালে বিশ্ব হেরিটেজ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। ইতিহাসবিদরা নালন্দা শব্দের উৎপত্তি নিয়ে একাধিক মত পোষণ করেছেন। নালন্দা শব্দের অর্থ হিসেবে তারা নানা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তবে তাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী নালন্দা শব্দের অর্থ জ্ঞানের যেখানে শেষ নেই।

নালন্দা শব্দের ব্যুৎপত্তি : 'নালং দদাতি ইতি নালন্দা' অথবা 'ন অলং দদাতি ইতি নালন্দা'— এই দুটি সংস্কৃত শ্লোক হলো নালন্দা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত উৎস, যার অর্থ হলো— 'যা পদ্মের নালের প্রাপ্তিস্থান' বা 'প্রচুর পদ্ম দানে যা সক্ষম'। ভারতীয় পরম্পরা ও সংস্কৃতিতে পদ্ম হলো জ্ঞানের প্রতীক। 'দা'-ধাতুর অর্থ 'যা কিছু দান করা হয়'। 'নালম্-দা' অর্থ—যা কিছু বিদ্যা বা জ্ঞান দান করে।

প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রে নালন্দার উল্লেখ: বৌদ্ধ গ্রন্থ দীঘ নিকায় থেকে জানা যায় যে মগধের রাজধানী রাজগৃহ (বর্তমান রাজগির) থেকে উত্তর-পশ্চিমে এক যোজন দূরত্বে একটি 'সমৃদ্ধ, জনাকীর্ণ' জনপদ ছিল নালন্দা। গৌতম বুদ্ধের বাসস্থানের জন্য নালন্দার একটি বিত্তশালী ব্যবসায়ী পরিবার তাদের আমবাগান দান করেছিলেন। পালি ভাষায় লিখিত একাধিক গ্রন্থে ভগবান বুদ্ধের অনেক বার রাজগৃহ থেকে নালন্দায় আসার উল্লেখ রয়েছে। নালন্দা সমীপে নালক নামে একটি গ্রামে বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্য সারিপুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই স্থানেই বৌদ্ধ ভিক্ষু ও উপাসকদের জন্য ভগবান বুদ্ধের শিষ্য সারিপুত্রের স্মৃতিতে নির্মিত হয় একটি চৈত্য।

চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং তাঁর গবেষণা পত্রে উল্লেখ করেছেন, মগধের প্রায় পাঁচশো জন ব্যবসায়ী দশ কোটি স্বর্ণ মুদ্রা বিনিয়োগের মাধ্যমে নালন্দার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল ক্রয় করেছিলেন। তিব্বতি ইতিহাসবিদ লামা তারানাথের (১৫৭৫-১৬৩৪) লেখা বিবরণ অনুযায়ী, সম্রাট অশোক নালন্দায় এসে সারিপুত্রের চৈত্যে পূজার্চনা করেছিলেন। এই স্থানে সারিপুত্রের স্মৃতিতে সম্রাট অশোক সুন্দর একটি মন্দিরও নির্মাণ করিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি এখানে একটি সুন্দর বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করেছিলেন। সারিপুত্রের এই চৈত্যকে কেন্দ্র করে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে যে ভিক্ষু বিহারগুলি গড়ে ওঠে, সেগুলিই পরবর্তী সময়ে সামগ্রিকভাবে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ পরিগ্রহ করে। আজও সেই বৌদ্ধ বিহারগুলির ধ্বংসাবশেষের কাছেই সারিপুত্র নামাঙ্কিত ও তাঁর স্মৃতিবিজড়িত সারিচক নামে একটি গ্রাম অবস্থিত।

বিশ্ববিদ্যালয় রূপে নালন্দার আবির্ভাব: সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মঠ নালন্দা— গুপ্ত রাজা শক্রাদিত্য কুমারগুপ্তর শাসনকালে (৪১৫-৪৫৫ খ্রিস্টাব্দ) বিশ্ববিদ্যালয় রূপে আত্মপ্রকাশ করে। গুপ্ত যুগে বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ ছাড়াও রাজ-অনুদানে বিশ্ববিদ্যালয়

পরিচালিত হতো। পরবর্তীকালে বালাদিত্য, তথাগতগুপ্ত প্রমুখ গুপ্ত রাজাদের সময়কালে নালন্দাতে চলে নির্মাণকাজ। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর প্রভূত উন্নতির মাধ্যমে ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যাচর্চার একটি সুবৃহৎ কেন্দ্র রূপে আবির্ভূত হয় নালন্দা। এর পরবর্তী অধ্যায়ে কনৌজ সম্রাট হর্ষবর্ধনের শাসনকালে এই শিক্ষাকেন্দ্রটি উৎকর্ষের সর্বোচ্চ শিখর আরোহণ করে। অষ্টম শতকের পরে বাঙ্গলার পাল বংশীয় রাজারা নালন্দার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন। নালন্দা থেকে কনৌজ শাসক যশোবর্মণের দান-অভিলেখও পাওয়া গিয়েছে। হিউয়েন সাং ও চীনা বৌদ্ধ ভিক্ষু ইৎসিঙের বর্ণনাতে যথাক্রমে ১০০ ও ২০১টি গ্রাম থেকে প্রাপ্ত রাজস্বে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহনের উল্লেখ পাওয়া যায়। এর সঙ্গে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজের উচ্চবিত্ত, ধার্মিক ব্যক্তিদের বিপুল পরিমাণ অনুদানের বিবরণও রয়েছে। হিউয়েন সাঙের বর্ণনা অনুযায়ী— গোরুর গাড়িতে করে প্রতিদিন শতাধিক মন চাল এবং ওই গ্রামগুলি থেকে প্রাপ্ত দুধ ও মাখন নালন্দাতে আসত।

নালন্দার প্রবেশিকা পরীক্ষা: প্রাচীন যুগে প্রতিষ্ঠিত নালন্দা মহাবিহারে শিক্ষাগ্রহণের জন্য প্রবেশাধিকার অর্জন ছিল খুবই কঠিন। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং তাঁর রচিত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা খুব সহজ ছিল না। এখানে শিক্ষার জন্য কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ছাত্রদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে হতো। শিক্ষার্থীদের বর্ণ, জাতি, ধর্ম অথবা শ্রেণী বিন্যাসের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নেওয়া হতো না। বরং মেধার ওপর ভিত্তি করে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নেওয়া হতো। বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে অবস্থানরত দ্বারপণ্ডিত প্রবেশপ্রার্থী শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণ করতেন। তাঁর নেওয়া মৌখিক পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হলেই মিলতো নালন্দাতে প্রবেশের সুযোগ। হিউয়েন সাং প্রতি দশজন শিক্ষার্থীর মধ্যে তিনজনকে সেই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে দেখেছিলেন। নালন্দাতে স্থান পাওয়া এবং সেখানে শিক্ষালাভ করে স্নাতক উপাধি লাভ করা বিদ্যার্থীরা সমাজে উচ্চ মেধা ও যোগ্যতাসম্পন্ন হিসেবে পরিগণিত হতেন।

নালন্দার পাঠ্যক্রম ও তার বিশ্বজোড়া খ্যাতি: নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন বৌদ্ধ সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বৌদ্ধ সাহিত্য ছাড়াও নালন্দায় পঠনপাঠনের পরিধি ছিল সুবিস্তৃত। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, ধর্মশাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র, পুরাণ, জ্যোতিষ, সাংখ্যদর্শন-সহ বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন ও সেই সংক্রান্ত গবেষণার কথা বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্রে উল্লেখিত হয়েছে। নালন্দায় বেদ, হেতুবিদ্যা (লজিক), ন্যায়শাস্ত্র, ভাষাবিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র ও জ্যোতিষের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার বিষয়টি হিউয়েন সাঙের বিবরণে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রখ্যাত যোগশাস্ত্রজ্ঞানী ও তৎকালীন সঙ্ঘস্থবির শীলভদ্র হিউয়েন সাংকে দণ্ডনীতি ও পাণিনি ব্যাকরণের পাঠদান করেন। মহাযান বৌদ্ধ দর্শনের কেন্দ্র ছিল অযোধ্যা।

ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্র ও প্রমাণশাস্ত্রের বিকাশলাভ হলো নালন্দার সর্বোৎকৃষ্ট দান। নালন্দা মহাবিহারের ধর্মপাল, চন্দ্রপাল, গুণমতী, স্থিতমতি, বুদ্ধভদ্র প্রমুখ মহান আচার্যের উল্লেখ তাঁর বিবরণে হিউয়েন সাং করেছেন। তিব্বতি রাজা সাং স্তং গম্পো তাঁর মন্ত্রী থান মি-কে শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য নালন্দায় প্রেরণ করেছিলেন।

বিভিন্ন সময়ে নালন্দার উপর আক্রমণ: বহুবার নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে বহিরাগত আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছে। বার বার আক্রমণের ফলে নালন্দা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরবর্তী সময়ে নালন্দাকে পুনর্নির্মাণ করা হলেও বহিরাগত আক্রমণের হাত থেকে নালন্দা রক্ষা পায়নি। পুরাতত্ত্ববিদ হাসমুখ ধীরজলাল সাঙ্কলিয়া (১৯০৮-১৯৮৯) তাঁর প্রকাশিত বই 'দ্য ইউনিভার্সিটি অফ নালন্দা'-তে লিখেছেন। কেল্লার মতো বিস্তৃত পরিসরে সম্পত্তি দখলে আক্রমণকারীরা বার বার নালন্দাকে নিশানা করেছিল। পরবর্তী সময়ে পুরাতত্ত্ববিদেরা এখানে খননকার্য চালিয়ে বহু প্রাচীন নথি, তাম্র মুদ্রা, ধাতু নির্মিত প্রত্নসামগ্রী পেয়েছেন।

নালন্দার পতনের কারণ হিসেবে অধিকাংশ ইতিহাসবিদদের মত হলো দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে মহম্মদ ঘোরির সেনাপতি বখতিয়ার খিলজির নেতৃত্বে আক্রমণকারীরা এই মহান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জ্বালিয়ে ধ্বংস করে নষ্ট করে দেয়। মিনহাজ-উস-সিরাজের লেখা তবকাৎ-ই-নাসিরি থেকে জানা যায় যে ত্রয়োদশ শতকে তুর্কি আক্রমণকারী বখতিয়ার খিলজি নালন্দায় হামলা চালায়। দুশো ঘোড়সওয়ার সমেত খিলজি নালন্দার ওপর ভয়াবহ আক্রমণ চালিয়ে লুঠপাট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিশাল গ্রন্থাগারে অগ্নিসংযোগ করে। অজস্র, অসংখ্য পুস্তক ও পুঁথিপত্র সংবলিত এই গ্রন্থাগার বহু মাস ধরে আগুনে জ্বলতে থাকে। এছাড়াও এই আক্রমণকারী অগণিত বৌদ্ধ ভিক্ষুকে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

অতীত গৌরব পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে প্রয়াস: এই ঘটনার বহু শতাব্দী পর ১৯৫১ সালে বিহার সরকার পালি, বৌদ্ধ সাহিত্য, সংস্কৃত, ইতিহাস-সহ বেশ কিছু বিষয়ে পঠনপাঠনের জন্য 'নব নালন্দা মহাবিহার'-এর স্থাপনা করে। ২০০৬ সালের ২৮ মার্চ তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালাম নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনঃস্থাপন করার জন্য প্রস্তাব দেন। এর পরবর্তী সময় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের গরিমা ও পাঠ্যক্রম উন্নয়নের জন্য ১৯১০ সালের ২১ আগস্ট এবং ওই বছরের ২৬ আগস্ট লোকসভায় বিভিন্ন প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

পরবর্তী কালে ২০১৪ সালে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তির কাজ শুরু হয়ে যায়। আমাদের পুরনো ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য নালন্দাকে আরও সুদূর পথ অতিক্রম করতে হবে। আশা করা যায় যে ভারত সরকারের এই সদর্থক প্রয়াস শিক্ষা ক্ষেত্রে আরও একবার বিশ্বগুরু হয়ে ওঠার লক্ষ্যে ভারতের পথ প্রদর্শক হয়ে উঠবে। এই লক্ষ্যে ভারত সরকারের ভূমিকা সার্বিক সার্থকতা লাভ করবে।

(লেখক প্রবীণ সাংবাদিক ও ইতিহাসবিদ)

পাত্রী চাই

কলকাতা মানিকতলা নিবাসী ডাক্তার পাত্রের জন্য কলকাতা অথবা পার্শ্ববর্তী জেলা নিবাসী, পশ্চিমবঙ্গীয় বনেদি পরিবারের ২৫ অনূর্ধ্বা, শিক্ষিতা, ৫৫, সুশ্রী, সুপাত্রী চাই। ডাক্তার পাত্রী অগ্রগণ্যা। দেবারি কিংবা দেবগণ কাম্য।

যোগাযোগ : ৮৭৭৭৮১৬৪০০

ফিরহাদের মন্তব্য হিন্দুদের বিপদ আরও বাড়াবে

এই রাজ্যে শাসক দলের বিরুদ্ধে কোনো বিষয়ে অভিযোগের আঙুল উঠলেই টিভি শো-তে উপস্থিত শাসক দলের প্রতিনিধিরা ভারত ভ্রমণে বের হন। তাঁদের প্রিয় গন্তব্য অবশ্যই উত্তরপ্রদেশ। একে তো বিজেপি শাসিত রাজ্য, তার ওপরে মুখ্যমন্ত্রী একজন গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী থাকার দরুন সেই সুযোগ নিয়ে হিন্দুধর্মকে যদি কোনো ছলছুতোয় অপমানের সুযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, মরুঝড়ের সময় উট বালিতে মুখ গুঁজলেও প্রলয় বন্ধ থাকে না।

ঠিক তেমনি চোপড়ার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এক টিভি শো-তে এরাজ্যের শাসক দলের প্রতিনিধি উত্তরপ্রদেশের আখলাখের ঘটনার সঙ্গে তুলনা করে হিন্দুত্ব ও হিন্দুত্ববাদীদের তুলোধোনা করলেন। চোপড়ার যুগলকে রাস্তায় ফেলে রাজ্যের শাসক দলের কর্মী তাজিমুল ইসলাম ওরফে জেসিবির বেধড়ক মারধোর ও নৃশংস অত্যাচার এবং স্থানীয় বিধায়ক হামিদুল রহমানের ঘনিষ্ঠ এই নেতাটির অপকর্ম আড়াল করতে খোদ বিধায়কের অত্যাচারিত মহিলাকে চরিত্রহীন বলে দেগে দেওয়া আর উত্তরপ্রদেশে মহম্মদ আখলাখের গোমাংস বহন করার অভিযোগকে যে একই বন্ধনীভুক্ত করা যায় না এটা একটা শিশুও বুঝবে। কারণ শেষোক্ত বিষয়টিতে মানুষের সেন্টিমেন্ট জড়িয়ে আছে। আর প্রথমটিতে ভীতিপ্রদর্শন করে মানুষের সেন্টিমেন্টকে হাতিয়ার করে অপরাধ করা হয়েছে। কার অনুপ্রেরণায় চোপড়ার বিধায়ক নির্যাতিতাকেই চরিত্রহীন বললেন সেটা এরাজ্যবাসীকে না বললেও চলে। আর মুখ্যমন্ত্রীও কিছু লোক দেখানো ধমকানি-চমকানি ছাড়া এর বেশি কিছু করবেন না, সেটাও সবাই জানে, কারণ ভোট বড়ো বালাই। কারণ দার্জিলিং লোকসভায় রাজ্যের শাসক দল হারলেও ব্যবধান যে কমাতে পেরেছে, তার মূলে চোপড়া বিধানসভায় ৯২ হাজারের লিড। এমন সোনার ডিম দেওয়া হাঁসকে কোনো দল শো'কজ করলেও তা যে লোককে দেখানোর উদ্দেশে এটাও সবাই বোঝে।

যাঁরা ব্যঙ্গ করে হিন্দুত্ববাদীদের বিরুদ্ধে বিষ উগরে দেন, তাঁদের উদ্দেশে আরেকটি ঘটনাও সামনে আনা হলো, যাতে বোঝা যাবে হিন্দুরা এরাজ্যে সত্যিই বিপদের মধ্যে আছে। সৌজন্যে রাজ্যের প্রভাবশালী মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তিনি হিন্দুদের অপমান করে এর আগেও সাম্প্রদায়িক বক্তব্য রেখেছেন। তবে সাম্প্রতিক ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োতে তাঁর মন্তব্য অতীতের সব মন্তব্যকে ছাপিয়ে গিয়েছে। 'আপনি যদি ইসলামে জন্মগ্রহণ না করে থাকেন, তবে আপনি নেহাতই একজন দুর্ভাগা, আপনাকে ইসলাম কবুল করানো ধর্মপ্রাণ মুসলমান মাত্রেরই পবিত্র কর্তব্য।'

গত ৩ জুলাই পোস্ট হওয়া 'এসএস টিভি পাবলিক' নামে লোগো দেওয়া একটি ইউটিউব চ্যানেলের ভিডিয়ো বিভিন্ন বিজেপি নেতার সৌজন্যে ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল (ভিডিয়োর সত্যতা যদিও স্বস্তিকা যাচাই করেনি)। ফিরহাদ হাকিমকে যাতে বলতে শোনা গেছে, 'যারা দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে, যারা ইসলাম নিয়ে জন্মায়নি, তাদেরও দাওয়াত-এ ইসলাম, অর্থাৎ ইসলামের দাওয়াতে দিয়ে তাদের মধ্যে ঈমান নিয়ে এলে এটা আল্লাতালাকে খুশি করা হবে। ইসলামকে তাদের মধ্যে ছড়াতে হবে। আমাদের নিজেদের শক্তিশালী মনে হয়, যখন দেখি সবাই এখানে টুপি পরে বসে আছে, দেখি হাজার হাজার মানুষ বসে আছে, তখন মনে হয় ইসলামের ঐক্য একটা জায়গায় আছে। যেখানে আমাদের কেউ কোনোদিন দাবাতে (দমাতে) পারবে না।'

ভিডিয়োয় এও দেখা গিয়েছে, ফিরহাদের বক্তব্য চলাকালীনই 'ইনশাল্লাহ' স্লোগান ওঠে। ফিরহাদ হাকিম নিজেও 'আল্লাহু আকবর' স্লোগান তোলেন। ফের তিনি বলতে শুরু করেন, 'একজনকেও যদি আমরা ঈমানের দিকে নিয়ে আসতে পারি তাহলে সত্যিকারের ইসলাম ধর্মের বৃদ্ধি হবে। আমরা জন্মগতভাবে ইসলাম নিয়ে জন্মেছি। ইসলাম নিয়ে জন্মানোর মানে আমাদের রসুল আমাদের জান্নাতের পথ সুদৃঢ় করে দিয়েছে। যদি বড়ো কোনো অন্যায় না করি তাহলে ইসলাম নিয়ে জন্মানো মানে জান্নাতে পৌঁছে যাওয়া।' সত্যি বলতে কী এটা এরাজ্যের প্রভাবশালী মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলছেন, না মধ্যপ্রাচ্যের কোনো মুসলিম ধর্মগুরু বলছেন নিজের চোখ-কানে না দেখলে-শুনলে বিশ্বাস করা শক্ত।

সব শেষে তিনি বলেন, 'বিশেষ করে কোরানের আলো ফাউন্ডেশনকে যে এরকম একটা তেলাওয়াতের কম্পিটিশনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে যার জন্য আপনারা সবাই একসঙ্গে এখানে সমবেত হয়েছেন।' হিন্দুধর্মকে অপমান অবশ্য ফিরহাদের কাছে নতুন নয়। অতীতে কখনো তাঁর মনে হয়েছে, 'হিন্দু ধর্ম কোথাও কোথাও ডিরেল্ড হয়ে যাচ্ছে।' আবার কখনো আশা প্রকাশ করেছেন, 'ইনশাআল্লাহ, একদিন এই বঙ্গের সব মানুষ উর্দুতে কথা বলবে।' এরপরও অবশ্য ফিরহাদ কসবায় দুর্গাপূজা উদ্বোধন করবেন, কলকাতার মহানাগরিক হিসেবে পূজার তদারকিও করবেন, আর হিন্দুরা সব দেখেশুনেও মৌনীবাবা সেজে থাকবেন। আমরা শুধু পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিতে চাইবো, নুপুর শর্মা হজরত মহম্মদ সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা টানা দুদিন অচল হয়েছিল, হিন্দুদের বিনিদ্র রজনী কেটেছিল, যদিও বহু মুসলমান স্কলারই নুপুরের বক্তব্যে কোনো ইতিহাসগত ত্রুটি দেখেননি। এই বিভেদকামী সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বন্ধ না হলে ও হিন্দুদের সচেতনতা না এলে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের ললাট লিখনে যে আরও দুর্ভাগ্য অপেক্ষা করে আছে তা বলাই বাহুল্য।

এরপরও অবশ্য ফিরহাদ কসবায় দুর্গাপূজা উদ্বোধন করবেন, কলকাতার মহানাগরিক হিসেবে পূজার তদারকিও করবেন, আর হিন্দুরা সব দেখেশুনেও মৌনীবাবা সেজে থাকবেন।

বিচারব্যবস্থার স্বদেশীকরণ সম্পন্ন হলো

ধর্মানন্দ দেব

১৮৬০ সালে তৈরি হয় 'ইন্ডিয়ান পেনাল কোড' (ভারতীয় দণ্ডবিধি)। তার পরিবর্তে ১ জুলাই ২০২৪ থেকে থেকে কার্যকর হয়েছে 'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা'। পাশাপাশি ১৮৯৮ সালের 'ক্রিমিনাল প্রসিডিওর অ্যাক্ট' (ফৌজদারি বিধি)-এর পরিবর্তে 'ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা' এবং ১৮৭২ সালের 'ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট' (ভারতীয় সাক্ষ্য আইন)-এর বদলে 'ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম'— মোট এই তিনটি নতুন ফৌজদারি আইন সমগ্র দেশে কার্যকর হয়েছে। প্রসঙ্গত, ভারতীয় দণ্ডবিধির রচয়িতা ছিলেন থমাস ব্যাবিংটন মেকলে। প্রথম আইন কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন তিনিই। জেমস ফিটজেমস স্টিফেন ছিলেন সাক্ষ্য আইনের রচয়িতা। প্রথম ফৌজদারি আইনটি ১৮৯৮ সালের। ১৯৭৩-এ নতুন আইন পাশ হওয়ার ফলে সেটি বাতিল হয়। সারা দেশে প্রতিদিনই আইন তিনটির প্রয়োগ ঘটে সব আদালতে, নিম্ন আদালত থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত। আমরা দেখতে পাই নতুন বিএনএস আইনে পুরানো আইপিসি'র ৯০-৯৫ শতাংশ ধারা শুধু 'কাট অ্যান্ড পেস্ট' করার পাশাপাশি ২৪টি ধারা মুছে ফেলা হয়েছে এবং যোগ করা হয়েছে ২২টি ধারা। বাকি ধারাগুলি রেখে দেওয়া হলেও, নম্বর পালটে সাজানো হয়েছে নতুন করে। অর্থাৎ নতুন বোতলে পুরানো মদ। এই সামান্য কিছু পরিবর্তন আইপিসি সংশোধনীর মাধ্যমে সহজেই করা যেত। প্রায় একই কাণ্ড ঘটেছে সাক্ষ্য আইন এবং সিআরপিসি'র ক্ষেত্রেও। এই কাণ্ড ভবিষ্যতে কিছু অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির জন্ম দেবে তা এখনই বলে রাখা ভালো।

নতুন ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতায় এখন ৫৩৩টি ধারা রয়েছে, ১৬০টি ধারা পরিবর্তন করা হয়েছে, ৯টি নতুন ধারা যুক্ত করা হয়েছে এবং ৯টি ধারা বাতিল করা হয়েছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় আগের ৫১১টি ধারার পরিবর্তে ৩৫৬টি ধারা থাকবে, ১৭৫টি ধারায় পরিবর্তন আনা হয়েছে, ৮টি নতুন ধারা যুক্ত করা হয়েছে এবং ২২টি ধারা বাতিল করা হয়েছে। ভারতীয় সাক্ষ্য বিধেয়কে আগের ১৬৭টির পরিবর্তে ১৭০টি ধারা থাকবে, ২৩টি ধারা পরিবর্তন করা হয়েছে, ১টি নতুন ধারা যুক্ত করা হয়েছে এবং ৫টি ধারা বাতিল করা হয়েছে।

চলতি আইন অনুযায়ী কেউ প্রতারণায় অভিযুক্ত হলে তার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০ ধারায় মামলা রুজু করা হয়। কিন্তু নতুন 'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা' অনুসারে প্রতারণার মামলা দায়ের করা হবে ৩১৮ ধারায়। এর পাশাপাশি, বদলে যাচ্ছে খুনের ঘটনায় মামলার ধারাও। বর্তমানে খুনের অভিযোগের ক্ষেত্রে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় মামলা রুজু হয়। নতুন আইনে তা রুজু হবে ১০৩ ধারায়। অনিচ্ছাকৃত ভাবে মৃত্যু ঘটানোর ক্ষেত্রে মামলার ধারা ৩০৪-এ থেকে বদলে হবে ১০৬। এছাড়া, খুনের মামলা-সহ দশ বছরের সাজা রয়েছে, এমন ধারায় মামলা হলে অভিযুক্তকে ৬০ দিনের মধ্যে যে কোনও ১৫ দিন পুলিশ নিজেদের হেফাজতে রাখতে পারবে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় আগের মতোই ১৫ দিনই থাকছে পুলিশি হেফাজতের মেয়াদ। আগের নিয়মে পুলিশি হেফাজতে পনেরো দিন অভিযুক্ত হাসপাতালে কাটালে ফুরিয়ে যেত হেফাজতের মেয়াদ। এখন সেটা সম্ভব হবে না।

স্বাধীনতার ৭৭ বছর পরে দেশের ফৌজদারি বিচারব্যবস্থা স্বদেশি হয়েছে। সম্পূর্ণ ভারতীয় নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে এই ন্যায় সংহিতা। আজ যখন নতুন এই নিয়ম কার্যকর হলো, সঙ্গে সঙ্গেই বাতিল হয়ে গেল ঔপনিবেশিক আইন

বর্তমানে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ এ ধারায় রয়েছে দেশদ্রোহ। নতুন বিলে তা পুরোপুরি বাদ যাচ্ছে। যদিও ভারতের সার্বভৌমত্ব, একতা ও অখণ্ডতা বিপন্ন হলে তা অবশ্য শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলেই গণ্য করা হবে। এক্ষেত্রে ন্যূনতম শাস্তি তিন বছর থেকে বৃদ্ধি করে সাত বছর করা হয়েছে। নতুন আইনে ১৮ বছরের কমবয়সি মেয়েকে ধর্ষণের সাজা হবে মৃত্যুদণ্ড অথবা আজীবন কারাদণ্ড। গণধর্ষণের ক্ষেত্রে ২০ বছর থেকে আজীবন জেলের সাজার কথা বলা হয়েছে। এমনকী, মহিলাদের হার বা মোবাইল ছিনতাইয়ের মতো ঘটনার বিচারের জন্য বিধান রয়েছে নতুন আইনে। যৌন হিংসার মামলার ক্ষেত্রে নির্যাতিত মহিলার বয়ান তাঁরই বাড়িতে একজন মহিলা ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে নথিবদ্ধ করার কথাও জানাচ্ছে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা। বিয়ে বা চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে মহিলাদের সঙ্গে যৌন সম্পর্কের অপরাধের জন্য ১০ বছরের সাজার কথা বলা হয়েছে এতে। বিএনএস-র ধারা ৬৯-এ বলা হয়েছে, যে কেউ প্রতারণামূলক উপায়ে বা বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে, কিন্তু তা পালনের কোনো ইচ্ছা না রেখে, কোনো মহিলার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করে, যা ধর্ষণের অপরাধের আওতায় পড়ে না, তাকে দশ বছর পর্যন্ত যে কোনো ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে এবং তাকে জরিমানাও দিতে হবে। এছাড়াও সন্ত্রাস ও রাষ্ট্রদ্রোহের মতো অপরাধের ক্ষেত্রেও আরও কঠোর সাজার কথার উল্লেখ থাকছে নতুন আইনে।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তি একজন ব্যক্তির স্বাভাবিক জীবনের অবশিষ্ট সময়ের জন্য কারাদণ্ড হিসেবে স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। আইপিসি—র ৫৩ ধারায় ৫ ধরনের শাস্তির বিধান ছিল যেমন—(১) মৃত্যু; (২) যাবজ্জীবন কারাদণ্ড; (৩) কারাবাস যা দুটি প্রকার— কঠোর ও সহজ; (৪) সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা এবং (৫) জরিমানা। নতুন আইনেও এই সবগুলি শাস্তির বিধান রয়েছে। শুধু একটি নতুন ৬তম ধরনের শাস্তি

ফঃ ২

(বিএনএস-এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে ধারা ৪ (এফ) চালু করা হলো--- সামাজিক/সম্প্রদায় পরিষেবা। জেলের বোঝা কমাতে প্রথমবারের মতো শাস্তি হিসেবে কমিউনিটি সার্ভিসকে বিএনএস-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং এটিকে আইনি মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। বিএনএস-র ধারা ৪-এর অধীনে শাস্তি হিসেবে কমিউনিটি সার্ভিস চালু করা হয়েছে, যদিও কমিউনিটি সার্ভিসের মধ্যে কী অন্তর্ভুক্ত তা নির্ধারণ করা হয়নি। আত্মহত্যার চেষ্টা, আইনানুগ ক্ষমতার প্রয়োগকে বাধা দেওয়া বা বাধ্য করা, মানহানি, মাতাল অবস্থায় জনসম্মুখে অসদাচরণ ইত্যাদি অপরাধের জন্য নির্ধারিত শাস্তির অতিরিক্ত হিসেবে কমিউনিটি সার্ভিস প্রদান করা যেতে পারে। বিএনএস-এর নতুন আইনে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সংযোজন করা হয়েছে। ইলেকট্রনিক্স ও ডিজিটাল রেকর্ড, ই-মেইল, সার্ভার লগ, কম্পিউটার, স্মার্ট ফোন, ল্যাপটপ, এসএমএস, ওয়েবসাইট, লোকেশনাল এভিডেন্স, মেল ও ডিভাইসে থাকা বার্তাগুলিকে যাতে আদালতে ব্যবহার করা যেতে পারে। সেজন্য অন্তর্ভুক্ত করার স্বার্থে নথির সংজ্ঞা সম্প্রসারিত করা হয়েছে। ফলে আদালতগুলি অনেক কাগজপত্রের স্তূপ থেকে মুক্তি পাবে।

নতুন আইনে এফআইআর থেকে কেস ডায়েরি, কেস ডায়েরি থেকে চার্জশিট এবং চার্জশিট থেকে রায় পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়া ডিজিটাল করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বর্তমানে শুধুমাত্র ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে আসামিদের হাজির করা গেলেও এখন সাক্ষ্য শুনানি-সহ পুরো বিচার করা যাবে ভিডিয়ো কনফারেন্সিঙের মাধ্যমে। অভিযোগকারী ও সাক্ষীদের সওয়াল জবাব, বিচার ও হাইকোর্টের বিচারে তদন্ত ও সাক্ষ্য রেকর্ডিং এবং আপিলের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া এখন ডিজিটাল পদ্ধতিতে করা যাবে। এ বিষয়ে ন্যাশনাল ফরেনসিক সায়েন্স ইউনিভার্সিটি এবং সারাদেশের কারিগরি বিশেষজ্ঞদের এই নয়া আইনে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এখন তল্লাশি ও বাজেয়াপ্ত করার সময় ভিডিয়োগ্রাফি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যেটি মামলার অংশ হবে এবং নিরপরাধ নাগরিকদের জড়ানো হবে না। এ ধরনের রেকর্ডিং ছাড়া পুলিশের কোনো চার্জশিট বৈধ হবে না। বিএনএস-এর ৪১ ধারায় 'সূর্যাস্তের পরে এবং সূর্যোদয়ের আগে ঘর ভাঙার' বিধান রয়েছে।

তাছাড়াও সাত বছরের উপরে শাস্তি হবে এমন সব মামলার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে ফরেনসিক রিপোর্ট বাধ্যতামূলক। নতুন আইনে একটি নতুন বিধান আনা হয়েছে যেখানে মৃত্যুদণ্ড কেবলমাত্র যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তরিত হতে পারে এবং শাস্তিদানের প্রথম সাত বছরের মধ্যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ক্ষমা করা যেতে পারে। আইপিসির ৪৯৯ (মানহানি)-ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অনুযায়ী, মানহানি পড়বে ৩৫৪ (১) ধারায় আওতায়। নতুন বিএনএস-এ ১৭৩ (২) ধারা অনুযায়ী দোষী এফআইআর এর কপি পেতে পারে। নতুন বিএনএসে ম্যাজিস্ট্রেটদের জরিমানা আরোপ করার সীমা আগের থেকে বৃদ্ধি করা হয়েছে। নতুন 'ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা' আইনে বলা হয়েছে, বাজেয়াপ্ত-পর্ব ক্যামেরার সাহায্যে রেকর্ড করতে হবে। ক্যামেরা না থাকলে কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার নিজের মোবাইল ফোনে পুরো প্রক্রিয়া রেকর্ড করতে পারবেন। তবে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেই রেকর্ডিং স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জমা দিতে হবে। প্রশ্ন হচ্ছে গোটা প্রক্রিয়ার ভিডিয়ো রেকর্ডিং করতে হলে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন দামি ফোন দরকার। সেই ফোন রাজ্যের পুলিশ অফিসারকে কে দেবে, তা নিয়ে কিছু বলা হয়নি। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কীভাবে ওই রেকর্ডিং জমা দেওয়া হবে, তা নিয়েও স্পষ্ট ভাবে নতুন আইনে কিছু বলা হয়নি।

আরও প্রশ্ন হচ্ছে, সে ক্ষেত্রে কি মোবাইল বা ক্যামেরাই ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জমা দিতে হবে? যদি-বা দেওয়া হয় ম্যাজিস্ট্রেট কতদিনের ভিতর ফিরিয়ে দেবেন তা স্পষ্ট নয়। অসমের বিভিন্ন জেলার থানা এলাকায় প্রতিদিন একাধিক অপরাধমূলক ঘটনা ঘটে। তাই বলে কি নীচুতলার পুলিশকর্মীদের একাধিক ফোন রাখতে হবে, না কি সরকারের তরফে মোবাইল দেওয়া হবে? এইসব নতুন আইনে অস্পষ্ট। বাজেয়াপ্ত ফোন রাখতে হবে, না কি সরকারের তরফে মোবাইল দেওয়া হবে? এইসব নতুন আইনে অস্পষ্ট। বাজেয়াপ্ত হওয়া ফুটেজ তদন্তের স্বার্থে সংরক্ষণ করতে হবে। কিন্তু তা কোথায় রাখতে হবে, সে ব্যাপারে কিছুই বলা হয়নি। ফলে পুলিশ এবং অন্যান্য তদন্তকারী সংস্থাগুলি প্রায়ই অস্পষ্ট নির্দেশনার কারণে আইনের অপব্যবহার করতে পারেন, যা বাজেয়াপ্ত সম্পদের যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে সমস্যা সৃষ্টি করবে। বাজেয়াপ্ত প্রক্রিয়ায় যথাযথ জবাবদিহি তা নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত বিধান নেই নতুন আইনে। তদন্তকারী অফিসারদের ক্ষমতার অপব্যবহার প্রতিরোধ এবং বাজেয়াপ্ত সম্পদের সঠিক হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য কার্যকরী পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা না থাকায় দুর্নীতি এবং স্বেচ্ছাচারিতা বৃদ্ধি পেতে পারে। সম্পদের সুরক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত বিধান না থাকায় সম্পদ হারিয়ে যাওয়া বা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বাজেয়াপ্ত সম্পদের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় তদন্ত প্রক্রিয়ায় প্রমাণ হিসেবে এসব সম্পদের ব্যবহার কঠিন হবে।

আবার বিএনএসএস-এর ২১৮ নম্বর ধারায় এক নতুন এক শব্দ deemed sanction জুড়ে দিয়ে ভালোই করেছে। ওই ধারা অনুসারে বিচারক এবং সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগের বিচার করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অনুমোদন নিতে হয়। এই অনুমোদন (sanction) নেওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু পুরানো সিআরপিসি'র ১৯৭ ধারায় ছিল। কিন্তু নতুন আইনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নির্দিষ্ট সময়সীমা অর্থাৎ ১২০ দিনের ভিতর রাজ্য বা কেন্দ্র সরকার অনুমোদনের আবেদনের কোনো উত্তর না দেয় তবে সেটাকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে (deemed sanction) বলে গণ্য করা হবে। নতুন তিনটি আইনের ত্রুটিগুলি সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি, যাতে আইনগুলি কার্যকরী ও সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ন্যায়বিচার পেতে পারেন। লেখাটি শেষ করব দেশের গৃহমন্ত্রীর শুভেচ্ছাবার্তা দিয়ে। দেশজুড়ে এই তিনটি আইন কার্যকর হওয়ার পরেই দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। গত ১ জুলাই সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ন্যায় সংহিতা কার্যকর হওয়ার পরে দেশের ফৌজদারি বিচারব্যবস্থা প্রকৃত অর্থে স্বাধীন হলো। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ৭৭ বছর কেটে গিয়েছে। এবার পুরোপুরি স্বদেশি হলো বিচার ব্যবস্থা। তিনি স্পষ্ট বলেন, 'স্বাধীনতার ৭৭ বছর পরে দেশের ফৌজদারি বিচারব্যবস্থা স্বদেশি হয়েছে। সম্পূর্ণ ভারতীয় নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে এই ন্যায় সংহিতা। আজ যখন নতুন এই নিয়ম কার্যকর হলো, সঙ্গে সঙ্গেই বাতিল হয়ে গেল ঔপনিবেশিক আইন।'

(লেখক পেশায় আইনজীবী)

ভোট পরবর্তী হিংসা এবং তার সমাধান

কর্নেল কুণাল ভট্টাচার্য

২০২১-এর ২ মে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল বেরোনোর পর ভোট পরবর্তী হিংসায় প্রায় ৬২ জনেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন। অনেকগুলি রাজ্যে বিধানসভা ভোট হলেও দুর্ভাগ্যবশত শুধু পশ্চিমবঙ্গে এই সন্ত্রাসের ঘটনা সংঘটিত হয়। ভারতের অন্য কোনো রাজ্য এহেন সন্ত্রাসের সাক্ষী থাকেনি। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হয় গত ৪ জুন। তারপর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিজেপি সমর্থকদের ঘরবাড়ি, দোকানপাট এবং অন্যান্য সম্পত্তি লুঠ ও অগ্নিসংযোগ-সহ নানা হিংসার খবর পাওয়া যাচ্ছে।

গত কয়েক দশক ধরে ভারতে নির্বাচন সংক্রান্ত হিংসার মূল ভিত্তি ছিল অর্গানাইজড্ ক্রাইম বা সংগঠিত অপরাধ। প্রতিটি হিংসাত্মক ঘটনার পেছনে ছিল সংগঠিত অপরাধচক্র। অপরাধী-অভিনেতা ও রাজনীতিকদের অশুভ সংযোগ এবং তাদের সঙ্গে প্রশাসনিক আধিকারিকদের যোগসাজশে প্রতিটি নির্বাচন নানাভাবে প্রভাবিত হতো। এই অসাধু ও নীতিহীন প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা দখলের পেছনে কাজ করতো ঘুষ সমেত নানারকমের প্রলোভন। এই অনৈতিক ব্যবস্থা রুখতে দরকার ব্যাপক সংস্কার। কোনো অপরাধে অভিযুক্ত বা অপরাধী- গোষ্ঠীর কোনো সদস্যকে রাজনৈতিক দলগুলির বিধানসভা বা লোকসভার টিকিট দেওয়া উচিত নয়। ভারতীয় আইন-কানুন এমনই যে কারাবন্দি একজন অপরাধী ভোট দিতে পারবে না, কিন্তু নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবে। আইনি ব্যবস্থায় এই অসঙ্গতি দ্রুত দূর করা প্রয়োজন।

ভারতে নির্বাচনী প্রক্রিয়া: জাতপাতের বিভাজন ছাড়াও শান্তিপ্রিয় হিন্দুদের ওপর জেহাদি আক্রমণ, ভীতিপ্রদর্শন ও সন্ত্রাসের ঘটনা নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালীন এবং ভোট পরবর্তী হিংসার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এই নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তার ঘেরাটোপে ৮,২৮,০০০ ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের ব্যবস্থা করে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন। এই কারণে দেশজুড়ে ভোটগ্রহণে প্রয়োজন ছিল বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী। নিরাপত্তা বাহিনীর চাহিদা পূরণে নির্বাচন কমিশন প্রতিটি রাজ্যের চিফ ইলেক্টোরাল অফিসার (মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক)-কে বিস্তারিত নির্দেশ জারি করে। এই নির্দেশে কোন বুথগুলি সেন্সিটিভ বা উত্তেজনাপ্রবণ, নির্বাচনী হিংসা রোধে কোথায় অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন প্রয়োজন সেই বিষয়গুলি নির্দিষ্ট করে সামগ্রিক পরিস্থিতির প্রাথমিক মূল্যায়ন করতে বলা হয়। ভোটে যেসব ব্যক্তি জালিয়াতি করতে পারে বা হিংসা ছড়াতে ভূমিকা নিতে পারে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে এই নির্দেশে বলা হয়। তাদের রাজ্যের কোন ভোটকেন্দ্রগুলি ভোটগ্রহণের পক্ষে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ তা শনাক্তকরণে 'ভালনারেবিলিটি ম্যাপিং'-এর মাধ্যমে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের একটি মেকানিজম্ বা পদ্ধতি তৈরির কথাও সেই নির্দেশে উল্লেখিত হয়। ভোট চলাকালীন রাজ্য পুলিশের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক পরিচালিত সিআরপিএফ, সিআইএসএফ, বিএসএফকে নিরাপত্তার কাজে বহাল করার ক্ষমতা নির্বাচনী আধিকারিকদের ছিল। এই কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্য পুলিশের ডিজি বা মহানির্দেশকের অধীনে কাজ করলেও নির্বাচন চলাকালীন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে।

নির্বাচনী প্রচারপর্বে রাজনৈতিক নেতাদের তরফে চলে হুমকি ও ভীতি প্রদর্শন। এছাড়াও জাতিগত, ধর্মীয় বা সামাজিক বিভাজনমূলক বক্তব্য পেশ থেকে শুরু করে ঘৃণাবাচক, বিষাক্ত, কুরুচিকর শব্দবন্ধ নেতাদের তরফে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিদ্বেষ ও উত্তেজনামূলক বক্তৃতা করে নির্বাচনী হিংসার উদ্রেক। ভয় দেখানো থেকে জবরদস্তি, শারীরিক আক্রমণ ও প্রহার— এই সন্ত্রাসের ঘটনাগুলি যখন ঘটে তখন বহু মানুষ আহত ও নিহত হয়। নারীর সম্ভ্রমহানির ঘটনা ঘটে। হিন্দুরা যে অঞ্চলগুলিতে দুর্বল ও সংখ্যালঘু, সেখানে তারা অতি সহজেই হয়ে ওঠে জেহাদি আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। নির্বাচনী প্রচারের সময় বিষাক্ত বক্তব্য চললে এবং তার দ্বারা সাধারণ মানুষ লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের শিকার হলে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর তরফে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

লোকসভা নির্বাচন শেষ হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ভোট পরবর্তী হিংসার প্রতিবাদে গত ২৪ জুন কলকাতায় সুবোধ মল্লিক স্কোয়্যার থেকে ধর্মতলার রানি রাসমণি রোড ক্রসিং পর্যন্ত একটি পদযাত্রা আয়োজিত হয়েছিল। পদযাত্রার পর অনুষ্ঠিত হয় একটি প্রতিবাদ সভা। সভার বক্তারা পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। কারণ ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে এটা পরিষ্কার যে শুধুমাত্র বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা ছাড়াও সমগ্র হিন্দু জনগোষ্ঠী জেহাদিদের লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছে। রাজ্যের বর্তমান চিত্র তুলে ধরেছে যে এই আক্রমণ ও সন্ত্রাস হলো নির্বাচন পরবর্তী হিংসার আড়ালে হিন্দু নিপীড়ন।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে একাধিক বক্তা গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মতো বিপ্লবীর নাম স্মরণ করেন। জেহাদি আক্রমণের বিরুদ্ধে গোপাল মুখোপাধ্যায়ের আগ্নেয় প্রতিরোধকে স্মরণ করে এই সময়ে তাঁর মতো নেতা ও নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তার কথা বক্তারা তুলে ধরেন। অবিভক্ত বঙ্গের তৎকালীন প্রিমিয়ার সোহরাওয়ার্দীর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বাঙ্গালি বিপ্লবীরা রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। নেতৃত্ব দিয়েছিলেন গোপাল মুখোপাধ্যায়। আজও বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ও তার শাসক দলের তরফে এই সীমাহীন সন্ত্রাস মোকাবিলায় হিন্দুদের সক্রিয় প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের বিষয়টি নিয়ে এই সভার বক্তারা সরব হন।

এই প্রতিবেদকের ধারণা যদিও একটু ভিন্ন। আওরঙ্গজেব ও টিপু সুলতানের মতো বাদশাদের আমলে ইসলামি সন্ত্রাসের নৃশংসতা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। সেই

আমলে কয়েক লক্ষ হিন্দুকে হত্যার ৫০০ বছর পরেও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের নির্মূল করা যায়নি। একই ভাবে ভারত হিন্দুরাষ্ট্র ঘোষিত হলেও অন্য কোনো মত বা পথের ওপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না। নিরুপদ্রবে তারা ভারতেই থাকবে। সামগ্রিকভাবে ভারতে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে এবং এই সমস্যার সমাধানে এই প্রতিবেদকের তরফে তিনটি প্রস্তাব রয়েছে।

প্রথমত, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী-সহ সমস্ত শীর্ষ সাংবিধানিক পদাধিকারী সংশিষ্ট পদে সর্বোচ্চ দুটি মেয়াদ অর্থাৎ ১০ বছর থাকতে পারবেন। ইতিমধ্যেই এই নিয়ম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমেত অনেক দেশে প্রয়োগ করা হয়েছে। যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানতেন যে ২০২১ সালে তার দুটি মেয়াদ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং তিনি তৃতীয় মেয়াদে মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবেন না, তবে তার প্রতিহিংসামূলক মনোভাব হয়তো কিছুটা কম হতো। পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী যদি তার দলের অথবা অন্য দলের কোনো ব্যক্তি হন, তাহলে রাজ্যে ভোট পরবর্তী হিংসা অনেকটাই কমবে। কারণ নতুন মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব নেওয়ার পর তাঁর কাজকর্মে ব্যস্ত থাকবেন। এই নিয়মে একনায়কতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার সুযোগ নেই।

দ্বিতীয়ত, নির্বাচন একটি নির্দিষ্ট সময় ব্যাপী সংঘটিত হওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ, ৭ দিন। এর ফলে কমিউনিস্ট কায়দায় রিগিং বা কারচুপি করা সম্ভব হবে না। এই ধরনের নিয়মে টেলিফোনে হুমকি, ভোট না দিতে দেওয়া ধমকি, বিরোধী দলের এজেন্ট ও কর্মীদের বাড়িতে ভোটের আগে সাদা থান পাঠিয়ে দেওয়া, শহরাঞ্চলে মানুষকে ভোটকেন্দ্রে যাওয়া আটকাতে হাউজিং কমপ্লেক্সের সামনে বোমাবাজি ইত্যাদি বন্ধ হতে পারে। কোনো ব্যক্তিকে তাঁর লোকসভা বা বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটের নির্ধারিত তারিখের ২ দিন আগে জরুরি কারণে যদি দূরে কোথাও যেতে হয়, তবে সেই ব্যক্তিকে মূল ভোটের দু'দিন আগে ভোটদানের সুযোগ দেওয়া উচিত। ভোটগ্রহণের ৭ দিন ভোটকেন্দ্র বা বুথ দখল বন্ধে যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন। কমিউনিস্ট আমলের সংগঠিত নির্বাচনী কারচুপির এই কৌশলটি তাদের উত্তরাধিকারী টিএমসি দলের সময়ে উন্নততর হয়ে উঠেছে! আগে বিরোধী সমর্থকদের বাড়িতে বৈধব্যের প্রতীক হিসেবে সিপিএম সাদা থান পাঠাতো। বর্তমান শাসক তৃণমূল কংগ্রেস বিরোধী সমর্থকদের বাড়িতে সাদা থানের সঙ্গে মিষ্টির প্যাকেট ও মালা পাঠায়। ভাবটা এইরকম যে বিরোধী দল করলে মরতে হবে। মৃতের স্ত্রীর জন্য বরাদ্দ সাদা থান। স্বামীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় শ্মশানঘাটে উপস্থিতদের জন্য বরাদ্দ মিষ্টির প্যাকেট। স্বামীর ফোটোতে দেওয়ার জন্য মালা। নির্বাচনের সময় সংক্ষিপ্ত হলে এই চাপা সন্ত্রাস ও হুমকি দূর করা সম্ভব।

তৃতীয়ত, প্রবাসী বাঙ্গালি বা নিজের নির্বাচনী ক্ষেত্র থেকে দূরে বসবাসকারী মানুষ যেন ভোট দিতে পারে। তাদের জন্য ভোটদানের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। অনেক শিক্ষিত মানুষ জানেন না যে কীভাবে পোস্টাল ব্যালট চাইতে হয় এবং কোথায় সেই ব্যালট পাঠাতে হয়। দিল্লি, মুম্বই, ব্যাঙ্গালোর, পুনে ও অন্যত্র পশ্চিমবঙ্গের প্রচুর পরিযায়ী শ্রমিক রয়েছে। সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী (যেমন রেল, প্রতিরক্ষা, ডাক বিভাগ ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় সংস্থায় কর্মরতরা) ও অন্যান্য রাজ্যে কর্মরত বেসরকারি কর্মচারীরা, কর্পোরেট ক্ষেত্রে কর্মরত ব্যক্তিরা ভোট দিতে পারেন না। প্রতিরক্ষা বাহিনীর বেশিরভাগ কর্মী ভোট দিতে পারেন না, কারণ তারা সবসময় তাদের নিজস্ব রাজ্যের বাইরে থাকেন।

এছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, উপসাগরীয় অঞ্চল ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিপুল সংখ্যক প্রবাসী ভারতীয় রয়েছেন। তাদের সংখ্যা প্রায় কয়েক কোটি। তারা গণতন্ত্রের এই উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পারেন না। এই কারণে ভারতে ভোটের সর্বোচ্চ হার ৬০-৬৫ শতাংশ। ফ্রান্সের উদাহরণ নিলে দেখা যায় যে ভারতের চন্দননগর ও পন্ডিচেরিতে (পুদুচেরি) অবস্থানরত ফরাসিরা ফরাসি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তাদের ভোট দিতে পারেন। একইভাবে মহাকাশে থাকা আমেরিকান মহাকাশচারীরা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট দিতে পারেন। ভারতের একটি রাজ্যের বাসিন্দা জীবিকার স্বার্থে অন্য রাজ্যে বসবাস করলে তার ভোটদানের অধিকার থাকা উচিত।

২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের আগে থেকেই পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু সমাজের লোকজনের ওপর আক্রমণের ঘটনা ক্রমবর্ধমান। শাসক দলের মদতপুষ্ট অপরাধী ও জেহাদিদের দ্বারা বিরোধী সমর্থকদের মধ্যে অনিশ্চয়তা ও ভয়ের বাতাবরণের কারণে বিরোধী দলের অনেকেই দীর্ঘ সময় ধরে ঘরছাড়া।

সূক্ষ্ম ও জটিল নির্বাচনী প্রক্রিয়াগুলির ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের ইলেক্টোরাল ম্যানেজমেন্ট বডি (ইএমবি) অত্যাধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ভিত্তিক সমাধান বা আইটি সলিউশন্সের প্রয়োগের উপর ইদানীং নির্ভর করছে। সহজ ও জনপ্রিয় এই আইটি সিস্টেমের মধ্যে রয়েছে বায়োমেট্রিক ভোটার রেজিস্ট্রেশন, ইলেক্ট্রনিক ভোটিং এবং নির্বাচনী পরিচয়পত্র (এপিক কার্ড)-এর সঙ্গে আধার লিঙ্কেজ। নির্বাচনী প্রক্রিয়াগুলি ঝঞ্ঝাটহীন ও দ্রুত সম্পন্ন হওয়া নিশ্চিত করতে পারে প্রযুক্তির ব্যবহার। হিউম্যান এর বা মানুষ ঘটিত ভুল-ত্রুটি সম্পর্কিত ঝুঁকি কমাতেও সহায়ক হয়ে উঠতে পারে এই প্রযুক্তি।

প্রযুক্তি ও ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিনের (ইভিএম) প্রতি মানুষের আস্থা স্থাপনে একটি হ্যাকাথন (হ্যাকিং প্রতিযোগিতা) আয়োজন করা যেতে পারে। পেপারলেস ভোটিং সিস্টেম ভারতে মাঝে মধ্যেই অকারণ বিতর্কের উদ্রেক করে। ভারতের বিরোধী দলগুলি নির্বাচনে পরাজিত হলেই ব্যালট পেপারে নির্বাচন করানোর দাবি তুলতে শুরু করে। জোরপূর্বক ছাপ্পাভোট, বলপ্রয়োগ করে জাল ভোট ইত্যাদি এখনও শাসক দলের পক্ষে সম্ভব ও সহজ। কলকাতা হাইকোর্ট সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্দেশে বলেছে যে নির্বাচন পরবর্তী হিংসা নিয়ন্ত্রণে না এলে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে কোর্ট আগামী ৫ বছর এই রাজ্যে থাকার নির্দেশ দেবে। দলদাস প্রশাসনকে পথে এনে এই ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস বন্ধে হাইকোর্টের তরফে কঠিন ও সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণের আশা পশ্চিমবঙ্গের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ রাখেন। □

ভারতীয় ফৌজদারি আইন সংস্কারে মোদী সরকার বিদেশি স্মৃতিচিহ্ন মুছে দিল

আনন্দ মোহন দাস

২০২৪ সালের ১ জুলাই ভারতীয় ফৌজদারি আইনের ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক দিন। এই আইনের সংশোধনের ফলে আইনজগতে এক নতুন দিগন্ত খুলে গেল। ভারতীয় বিচার প্রক্রিয়ায় নতুন দণ্ডসংহিতায় দেশ 'স্ব'-এর পথে এককদম এগিয়ে গেল। গান্ধীজী যে স্বরাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন তার বাস্তবায়নের দিকে স্বাধীনতার ৭৫ বছর পর মোদী সরকার সংসদে বিধি সংশোধন করে তা কার্যকরের মাধ্যমে বিগত সরকারের প্রতিশ্রুতি পূরণ করল। এই ফৌজদারি আইনের সংস্কারের ফলে বিদেশি স্মৃতিচিহ্ন যেমন মুছে গেল, এই আইনকে আরও বেশি সময়োপযোগী করে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো। বিচার প্রক্রিয়ায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কোনো দেশ বা জাতি কোনো বিদেশিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কখনও বড়ো হতে পারে না। দেশের নিজস্বতা ফিরিয়ে আনতে না পারলে কোনো দেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হয় না। আত্মনির্ভর ভারত গড়লে বা দেশকে 'স্ব'-এর উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে

প্রকৃত স্বরাজ ফিরবে। একথা সত্য, পরনির্ভরতা ও পরানুকরণ মানুষকে পরজীবী করে তোলে, মানুষ আত্মবিশ্বাস হারিয়ে হীনম্মন্যতায় ভোগে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা— এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে?'

তিনি আরও বলেছেন, 'অপর কাহাকেও অনুকরণ করিতে যাইও না। অন্যদিগকে এই আর একটি বিশেষ বিষয়ে স্মরণ রাখতে হইবে— অপরের অনুকরণ সভ্যতা বা উন্নতির লক্ষণ নহে। আমি নিজেকে রাজার বেশে ভূষিত করতে পারি, তাতেই কি আমি রাজা হইব? সিংহচর্মাবৃত গর্দভ কখনও সিংহ হয় না।' অর্থাৎ তিনি স্বাবলম্বী হবার কথা বলেছেন। সেই দিক থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের বর্তমান পদক্ষেপ

প্রশংসনীয়। কিন্তু কিছু অর্বাচীন বিরোধী রাজনৈতিক দল বিশেষ করে ইন্ডি জোটের কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস , সমাজবাদী পার্টি, ডিএমকে, সিপিআই, সিপিএম, আরজেডি, আপ প্রভৃতি রাজনীতির আঙিনায় ন্যায় সংহিতার বিরোধিতা করে চলেছে। এরা মূল্যায়নে বিশ্বাসী নয়, বিরোধিতায় বিশ্বাসী।

প্রকৃতপক্ষে এরা দেশের স্বাবলম্বী হওয়ার চেয়ে বিদেশি স্মৃতিচিহ্ন বহন করতে বেশি ভালোবাসে। কংগ্রেসের নেতা রাহুল গান্ধী বিদেশে গিয়ে দেশের বদনাম করতেও ছাড়েন না। যারা বিদেশি সংস্কৃতি ও শিক্ষায় বিশ্বাসী তাদের কাছে এই ধরনের পদক্ষেপ পছন্দ না হওয়াই স্বাভাবিক। সেই কারণেই বিগত ৭০ বছর ব্যাপী শাসনকালে তারা এ বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রয়োজন মনে করেনি। আর দেশের মধ্যে বিদেশি শাসকের প্রতিভূ যারা, তারা তো বিরোধিতা করবেই। ২০২০ সাল থেকে এই আইন সংস্কারের বিষয়ে বিভিন্ন ফোরামে আলোচনার পর এই ধরনের আইন প্রণয়নে সরকার উদ্যোগী হয়েছে। সংসদে বিতর্কে অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বলেছেন, তিনি নিজে এই ধরনের ১৫৮টি আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেছেন। এই আইন সংশোধনের আগে সকল সংবাদ সদস্য, মুখ্যমন্ত্রীরা, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, আইপিএস ও কালেক্টরদের কাছ থেকে এ বিষয়ে মতামত ও পরামর্শ চাওয়া হয়েছিল। সুতরাং বিষয়টি পরিষ্কার য়ে বিশদ আলোচনা ও বিতর্কের পরই সরকার এই ফৌজদারি আইনের সংস্কারে অগ্রসর হয়েছে। সুতরাং বিরোধীদের বিনা আলোচনায় আইন প্রণয়নের অভিযোগের কোনো সারবত্তা নেই। সরকারের তড়িঘড়ি সিদ্ধান্তের অভিযোগেরও কোনো ভিত্তি নেই। সর্বভারতীয় বার কাউন্সিল এবং কলকাতা হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজ্যে মুষ্টিমেয় কিছু আইনজীবী আইন প্রত্যাহারের দাবিতে কর্মবিরতি পালন করেছেন। যদিও এই সংশোধিত ফৌজদারি আইন যথারীতি চালু হয়ে গেছে। ওইদিন সারা দেশে ৭৫টির বেশি এফআইআর এই নতুন আইনে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এমনকী পশ্চিমবঙ্গেও ওইদিন ১৫ মিনিটের মধ্যে তিনটি এফআইআর রেজিস্টার্ড হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, কেবলমাত্র সমস্ত কেন্দ্র শাসিত রাজ্যে তিনটি ফৌজদারি আইন-ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ও ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম আগামী ১৫ আগস্টের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে চালু হবে। সংসদে বিতর্কে অংশ নিয়ে সম্প্রতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিরোধীদের জানিয়েছেন নিছক বিরোধিতা না করে খোলামনে এখনও কোনো গঠনমূলক পরামর্শ থাকলে তা জানাতে আহ্বান জানিয়েছেন এবং সরকার এ বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে প্রস্তুত।

যাইহোক, এই দণ্ডবিধির বর্তমানে যে সংস্কারগুলি করা হয়েছে মূলত তা নিম্নরূপ।

প্রথমত, তিনটি ফৌজদারি আইনের স্বদেশি নামকরণ করা হয়েছে। (ক) ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, (খ) ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, (গ) ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম।

দণ্ডসংহিতায় ফৌজদারি আইনের সংস্কার :

১. গণপিটুনির ঘটনায় (পাঁচ বা তার বেশি ব্যক্তি) দোষীদের জেল জরিমানার পাশাপাশি মৃত্যুদণ্ড।

২. ১২ বছরের কমবয়সি কিশোরীকে ধর্ষণ বা গণধর্ষণ করা হলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড।

৩. বিয়ে, চাকরি বা পদোন্নতির ভুয়ো প্রতিশ্রুতি দিয়ে কোনো মহিলার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করলে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও জরিমানা। পরিচয় গোপন করে বিয়ে করলেও ১০ বছরের কারাদণ্ড।

৪. পণঘটিত কারণে কোনো গৃহবধূর মৃত্যু হলে ন্যূনতম ৭ বছরের ও সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

৫. সঙ্ঘবদ্ধ অপরাধে (অপহরণ, ডাকাতি, মুক্তিপণ, সাইবার ক্রাইম) কেউ মারা গেলে ন্যূনতম ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা ও মৃত্যুদণ্ডের সুপারিশ। ছোটো মাপের সঙ্ঘবদ্ধ অপরাধের ঘটনায় জরিমানা এবং ৭ বছরের জেল।

৬. ছিনতাইয়ের ঘটনায় জরিমানার পাশাপাশি সর্বাধিক ৩ বছরের সাজা।

৭. প্রথমবার ছোটোখাটো অপরাধে কমিউনিটি সার্ভিস।

৮. চিকিৎসার গাফিলতিতে কমপক্ষে দুই বছরের শাস্তি।

৯. সন্ত্রাসবাদে অভিযুক্তদের মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আইন। অপরাধীরা প্যারোলের সুবিধা পাবেন না।

১০. চালকের অসতর্কতায় গাড়ির আঘাতে কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হলে দুই থেকে পাঁচ বছরের জেল।

১১. ব্রিটিশের তৈরি কঠোর দেশদ্রোহের আইন উঠে গেছে। তবে সরকার বিরোধিতায় নেমে ভারতের ঐক্য ও সার্বভৌমত্বের পক্ষে বিপদ হয়ে উঠলে জরিমানা, সাত বছরের থেকে সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

উল্লেখ্য, আদালতে পুরানো বকেয়া মামলাগুলি নিষ্পত্তি হওয়ার পরই এই নতুন ফৌজদারি আইন আদালতের বিচার প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণভাবে লাগু হয়ে যাবে।

দীর্ঘদিনের 'ইন্ডিয়ান পেনাল কোড, সিআরপিসি ও ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্টের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা বাববার বিভিন্ন ফোরামে আলোচিত ও লেখালেখি হয়েছে। সেজন্য বিপুল বাধা সত্ত্বেও পুরাতন ফৌজদারি কার্যবিধির সংস্কারে কেন্দ্রীয় সরকারের বর্তমান সাহসী পদক্ষেপ অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। আত্মনির্ভর ভারত নির্মাণে মোদী সরকারের ভূমিকা অভিনন্দনযোগ্য। আগামীদিনে এই সরকার দেশের স্বার্থে আরও বেশি এই ধরনের আইনি সংস্কার গ্রহণ করবে বলে দৃঢ় বিশ্বাস। □

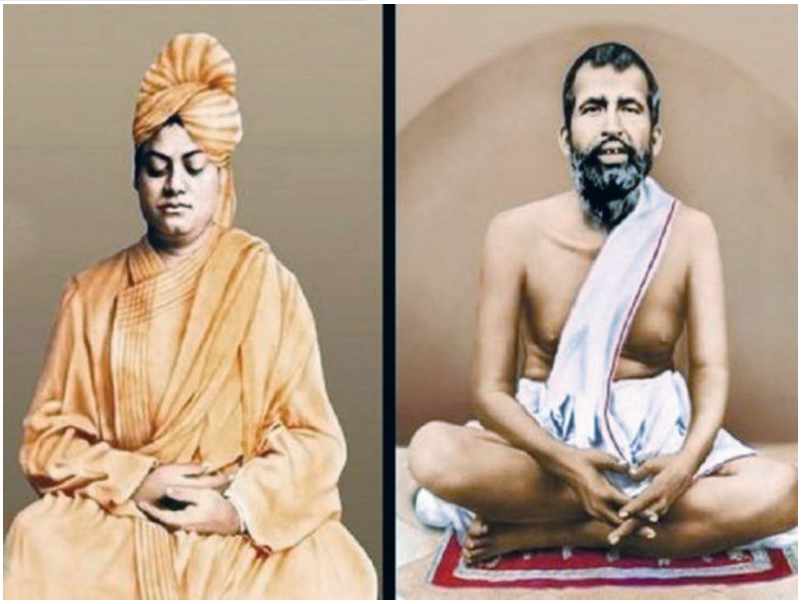

নরেন্দ্র এবং নরেন্দ্রর তিনি

কেমন গুরু শিষ্য?

ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়

ইংল্যান্ডের ওয়েস্ট এন্ডে ১৮৯৫ সালের এক রবিবারের গোধূলিবেলায় এক ড্রইংরুমে বসে বক্তৃতা দিচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দ। প্রশ্নোত্তর পর্বে বলছেন, 'যে ধর্মমত সম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধ (পরিণতি লাভ করে), তাহার সম্পর্কে ভারতের তেমন আস্থা নাই।' আরও বলছেন, 'আমাদের বিশ্বাস 'সঙ্ঘ' থেকে চিরকালই নতুন উৎপাতের সৃষ্টি হয়ে থাকে।' মন্তব্যটি পাওয়া যায় ভগিনী নিবেদিতা প্রণীত 'The Master as I saw Him' গ্রন্থের স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজকৃত বঙ্গানুবাদ 'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি' গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে। নিবেদিতাকে ওই গ্রন্থে বলতে দেখা যায়, 'পাশ্চাত্যদেশে তিনি (স্বামীজী) কোনো বিশেষ আচার্যের কথা বলেন নাই, কোনো এক সীমাবদ্ধ সম্প্রদায়ের মতো ঘোষণা করেন নাই। 'হিন্দুগণের ধর্ম-সম্বন্ধীয় ধারণাবলী'— ইহাই ছিল তাঁহার শিকাগো বক্তৃতার বিষয়; এবং ইহার পরেও, যে সকল তত্ত্ব বহু অংশে বিভক্ত সনাতন হিন্দুধর্মের সাধারণ সম্পত্তি ও বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক, কেবল সেইগুলিই তাঁহার বক্তৃতায় স্থান পাইত।' অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে গুরুবাদ নয়, সম্প্রদায়ের প্রচার নয়, সামগ্রিক হিন্দুধর্মকে বিশ্লেষণ এবং বিশ্লিষ্ট অংশগুলির সাধারণ ধর্ম আবিষ্কার করতে যত্নবান হয়েছিলেন স্বামীজী।

শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে স্বামীজীর কাছে বলতে শোনা যায় (মার্চ, ১৮৯৭, তথ্যসূত্র : স্বামী-শিষ্য-সংবাদ), 'মধ্যে মধ্যে আমার মনে হয় আপনারাও এইরূপে উৎসব-প্রচারাদি করিয়া ঠাকুরের নামে আর একটা সম্প্রদায়ের সূত্রপাত করিতেছেন। আমি নাগ মহাশয়ের (শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহীশিষ্য দুর্গাচরণ নাগ) মুখে শুনিয়াছি, ঠাকুর কোনো দলভুক্ত ছিলেন না।' শিষ্য অভিযোগের সুরে আরও বলেছিলেন, স্বামীজীরা রামকৃষ্ণগত প্রাণ। যদি ঠাকুরকে ভগবান বলেই জেনে থাকেন, তবে কেন ইতরসাধারণকে তা একেবারে বলে দিচ্ছেন না! স্বামীজী সেদিন মতপ্রকাশ করেছিলেন, এখনকার ভাব হওয়া উচিত সম্প্রদায়বিহীনতা। ঠাকুর ওইটাই দেখাতে জন্মেছিলেন। বলেছিলেন, 'তুই তো আমার বক্তৃতা পড়েছিস। কই, কোথায় ঠাকুরের নাম করেছি? খাঁটি উপনিষদের ধর্মই তো জগতে বলে বেড়িয়েছি।'

এই নরেন্দ্রকে দেখামাত্র গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন বুঝেছিলেন (১৮৮১ সালের নভেম্বর মাসে), এ সেই ব্যক্তি, জ্যোতির্ময় বর্ত্মে সপ্তর্ষিমণ্ডলের প্রবীণ ঋষি, যাকে ধরাধামে লীলাসহচররূপে আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছিলেন তিনি জ্যোতির্ময় বিগ্রহ দেবশিশু রূপে। সেই নরেন্দ্রই যখন তাঁকে বললেন, 'আমার ইচ্ছা হয়, শুকদেবের মতো একেবারে পাঁচ-ছয় দিন সমাধিতে ডুবে থাকি, তারপর শুধু দেহরক্ষার জন্য খানিকটা নেমে এসে আবার সমাধিতে চলে যাই', গম্ভীর হয়ে গেলেন গুরু, এ কী কথা! ধিক্কার না দিয়ে পারলেন না, 'ছিঃ, ছিঃ, তুই এতো বড়ো আধার— তোর মুখে এই কথা! আমি ভেবেছিলুম, কোথায় তুইও একটা বিশাল বটবৃক্ষের মতো

> "স্বামীজী স্বীকার করেছেন, বাইরের সহায়তার প্রয়োজন নিশ্চয়ই হয়, কিন্তু ভেতরে পদার্থ না থাকলে শত সহায়তাতেও কিছু হয় না।"

হবি— তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই শুধু নিজের মুক্তি চাস্!'

অতএব নরেন্দ্রর নির্বিকল্প সমাধি-সহ সকল কর্মের চাবি অগত্যা নিজের হাতে রেখে দিলেন গুরুদেব, যখন কাজ শেষ হবে, তখন চাবি খুলবেন। আবার নরেন্দ্রকেই যথাসর্বস্ব দিয়ে ফকির হয়েছিলেন গুরু, 'তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক কাজ করবি। কাজ শেষ হলে পরে ফিরে যাবি।' তারপর গুরুদেবের তিরোধানের কাল ঘনিয়ে এলো।

কথামৃতে দেখা যায়, মঠ ও মিশনরূপ মালঞ্চের জন্য তাঁর আদরের নরেনকে দলপতি নির্বাচিত করে যাচ্ছেন গুরুদেব স্বয়ং। ১৮৮৪ সালের ২৩ মার্চ নরেন সম্পর্কে বলছেন, 'দলপতি টলপতি হয়ে যেতে পারে।' আরও বলছেন, 'ও যে দিকে যাবে, সেই দিকেই একটা কিছু বড়ো হয়ে দাঁড়াবে।' নরেন নিজেও তা জানতেন ঠাকুরের নির্দেশও এমনটাই ছিল। প্রমদাদাস মিত্রকে লেখা চিঠিতে তার আভাস পাওয়া যায়, 'আমার উপর তাঁহার নির্দেশ এই যে, তাঁহার দ্বারা স্থাপিত এই ত্যাগীমণ্ডলীর দাসত্ব আমি করিব, ...তাঁহার আদেশ এই যে, তাঁহার ত্যাগী সেবকমণ্ডলী যেন একত্রিত থাকে এবং তজ্জন্য আমি ভারপ্রাপ্ত।'

শ্রীরামকৃষ্ণের উপস্থিতিতে ষোলো-সতেরো জন তাপসকে নিয়ে রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী সঙ্ঘের সূচনা হয়েছিল কাশীপুর বাগানবাড়িতে। সেখানে এগারোজন ত্যাগীভক্তকে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে গেরুয়া বস্ত্র দান করেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ, রাখাল, বাবুরাম, নিরঞ্জন, যোগীন্দ্র, তারক, শরৎ, শশী, কালী, লাটু এবং বুড়োগোপাল পেলেন গেরুয়া সন্ন্যাস। এই মঠেই ১৮৮৬ সালের পয়লা জানুয়ারি তিনি 'কল্পতরু' হলেন। গুরুভ্রাতাদের প্রতীতি জন্মাল, সারদাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণের 'শক্তি', তিনি মিশনের সহায়িকা সঙ্ঘজননী। ঠাকুরের জন্য সংসারত্যাগ করে আসা যুবকদের সঙ্ঘবদ্ধ করলেন নরেন্দ্রনাথ। এই কাজে নরেনের মধ্যে যথাসর্বস্ব শক্তি আগেই সঞ্চার করে দিয়েছিলেন গুরু। ১৮৮৬ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে হাতে লিখে যাচ্ছেন, 'নরেন শিক্ষে দিবে, যখন ঘরে বাইরে হাঁক দিবে।' কাশীপুর বাগানবাড়িতেই নরেন্দ্রনাথ নির্বিকল্প সমাধি-সুখ আস্বাদন করেছিলেন ঠাকুরের আশীর্বাদে। ঠাকুরের কাছ থেকে তিনি সংগঠন তৈরির উপদেশ পেলেন এবং নেতার ভূমিকায় সংস্থাপিত হলেন— 'দ্যাখ নরেন, তোর হাতে এদের সকলকে দিয়ে যাচ্ছি। কারণ, তুই সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী। এদের খুব ভালোবাসবি। আর ঘরে ফিরে না গিয়ে সবাই যাতে একসঙ্গে খুব সাধন ভজনে মন দেয় তার ব্যবস্থা করবি।'

'গাই গীত শুনাতে তোমায়' কবিতায় স্বামীজী লিখছেন,

'বাণী তুমি, বীণাপাণি কণ্ঠে মোর
তরঙ্গে তোমার ভেসে যায় নরনারী।'

হ্যাঁ, ভেসেই তো গিয়েছিল আমেরিকা; Eleanor Stork-এর গ্রন্থে আছে (১৯৮৮), 'Columbus discovered the soil of America but Swami Vivekananda discovered the soul of America'।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মূলমন্ত্রে দেখা যায়, 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'। নিজের মোক্ষ লাভের জন্যই জগতের জন্য সেবাকাজ করতে হবে। এই সেবাব্রতকে বৃহত্তর সমাজ ক্রমে স্বাগত জানাতে থাকল। শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শ সাধনজীবনের অঙ্গ হলো।

শিষ্যের বার্তা ছিল শূদ্র-জাগরণের কথা। 'স্বদেশ মন্ত্র'-তে সেই বার্তার আবিষ্ট মনের আত্মপ্রকাশ— সর্বতন্ময়ীভূত সম্বিতের বিদ্যুৎপ্রবাহ দেখতে পাওয়া যায়, 'ভুলিও না— নীচ জাতি মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।' শিষ্য এই বার্তা কোত্থেকে পেলেন? তাঁর গুরু একবার এক অস্পৃশ্য মেথরের বাড়ি পরিষ্কার করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তাতে মেথর সম্মত হলো না। একে ব্রাহ্মণ, তায় আবার সন্ন্যাসী, সম্মত হবেন-বা কী করে! স্বামীজীর গুরু গভীর রাত্রে অজ্ঞাতসারে লোকটির বাড়ি ঢুকে পায়খানা পরিষ্কার করতে লাগলেন। নিজের বড়ো বড়ো চুল দিয়ে সেই জায়গা মুছেও দিতেন। দিনের পর দিন এরকম চললো; যেন নিজেকে সকলের চাকর ও সেবক করে তোলার অনবদ্য সাধনা! স্বামীজী বলেছেন এমন লোকের শ্রীচরণ তিনি মাথায় ধরে আছেন। তাই স্বামীজীর রচনাবলীর মধ্যে বেশি করে পাওয়া যায় শূদ্র-জাগরণের কথা।

স্বামীজীর দেশপ্রেমও এসেছে তাঁর গুরুর কাছ থেকে। মা সারদার ধারণা ছিল, নরেন বেঁচে থাকলে কোম্পানি তাকে জেলে ভরে রাখত। শ্রীরামকৃষ্ণের পদধূলিরঞ্জিত দক্ষিণেশ্বরের মৃত্তিকা বিপ্লবীদের কাছে ছিল এক tremendous explosive material। কারণ গুরু একবার শিষ্য নরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, 'মনে রাখিস ইংরেজরাই এদেশের সর্বনাশ করছে।' স্বামীজীর কণ্ঠেও শোনা যায়, 'তারা আমাদের গলায় পা দিয়ে থেঁতলেছে, নিজেদের সুখের প্রয়োজনে আমাদের শেষ রক্তবিন্দু চুষে খেয়েছে, লুঠে নিয়ে গেছে আমাদের লক্ষ লক্ষ টাকা।'

গুরু শিষ্যকে কী দিতে পারেন, কতটুকু শিষ্যের নিজের হাতে— এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে স্বামীজী একবার বলেছেন, 'বীজের শক্তিতেই গাছ হয়, জলবায়ু কেবল উহার সহায়ক মাত্র। ...আপনার নিয়তি আপনার হাতে।' স্বামীজী স্বীকার করেছেন, বাইরের সহায়তার প্রয়োজন নিশ্চয়ই হয়, কিন্তু ভেতরে পদার্থ না থাকলে শত সহায়তাতেও কিছু হয় না। আত্মানুভূতির একটা সময় আসতে হয়, পূর্ণ বিকাশের সময়। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে বলতেন, 'কৃপা-বাতাস তো বইছেই, তুই পাল তুলে দে না।' □

কলকাতায় সরকারি আইন অনুযায়ী কত হকার বসতে পারে?

তৃণমূল সরকারের ২০১৪ সালের পথবিক্রেতা (জীবিকা সুরক্ষা ও পথব্যবসা নিয়ন্ত্রণ) আইন অনুযায়ী শহরের আড়াই শতাংশ জনতা হকারি করবেন! ইন্টারনেটে এই আইনটি কোথাও খুঁজে পাইনি।

ধরে নিই বর্তমানে কলকাতার জনসংখ্যা দেড় কোটি। আইন অনুযায়ী ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার হকার বৈধ ভাবে ব্যবসা করতে পারে। বর্তমানে হয়তো ১ লক্ষ হকার আছে। কলকাতায় দেড়কোটি মানুষ কত জায়গায় বাস করে, এর সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। মোট রাস্তা কত দীর্ঘ? আর ৮-১০ ফুট চওড়া ফুটপাথের মোট দৈর্ঘ্য কত?

হকার কাকে বলে? এক জায়গায় বসে না হেঁটে কোনো দ্রব্য বিক্রি যারা করে, তাদেরকে কি হকার বলে? হকার পিছু কত বর্গফুট জায়গা বরাদ্দ? ধরে নিই ৫০ বর্গফুট। এক যাত্রায় দু'রমক ফল হতে পারে না সরকারি নিয়মে। কাজেই সবাইকে বসিয়ে হকারি করতে দিলে ১ কোটি ৮৭ লক্ষ ৭৫ হাজার বর্গফুট জায়গা দরকার। প্রশ্ন আসে, কলকাতার মোট ফুটপাথের আয়তন কত? কলকাতায় কি ৪৪৪ মাইল লম্বা, ৮-১০ ফুট চওড়ার ফুটপাথ আছে?

ফুটপাথ কাকে বলে, এই সংজ্ঞা পশ্চিমবঙ্গের আইনমতে কী? আর কলকাতার ফুটপাথের প্রস্থ কত, যা ব্রিটিশরা বানায়নি, রাজ্য সরকার বাড়িয়েছে? সরকারের বানানো ৮ ফুটের বেশি ফুটপাথ চোখে পড়েনি। প্রস্থের ৬৬ শতাংশ ছেড়ে দোকান করার আইন। এই আইন জানা নেই, কমপক্ষে কতফুট চওড়া ফুটপাথের জায়গা পথচারীদের জন্য ছাড়তেই বাধ্য। ধরে নিই ৬ ফুট। তাহলে কলকাতায় সর্বাধিক কত হকারকে বসার জায়গা দিতে পারে সরকার তার বানানো আইন অনুযায়ী? পাঁচ হাজার?

এই রকম বোকা বোকা আইন কারা ড্রাফট করে দিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে? বেহালায় কোনো ফুটপাথ নেই যা ৮ ফুট চওড়া। বেহালাতে রাস্তা দখল করেই হকাররা বসেছে। আইনত রাস্তায় হকারি নিষিদ্ধ। সরকারের উচিত ভাড়াটিয়া আইন পরিবর্তন করা। বাড়ির উপর কখনোই ভাড়াটিয়ার আজীবন থাকার, ব্যবসা করার অধিকার হতে পারে না। এই জন্য বাড়ি ভেঙে পড়ে অনেক মানুষ মারা যায়। দায়ী সরকার।

সরকার হকার আইন যা করেছে, সেটা মেনে রোটেশন করে, লটারি করে ২ বছরের জন্য এক একজন হকারকে লিজ দিক। সরকারি জমির উপর কোনো গরিব বা ধনীর বংশপরম্পরায় অধিকার থাকার আইন ভারতে নেই! গরিব অথচ ইঁদুরের মতো জন্ম দেবে, এদের ভরণপোষণ দেবার দায় কেন ট্যাক্স পেয়ারদের উপর আসবে? রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের আয় থেকে দিক। যারাই বাঁচার জন্য সরকারি সাহায্য নেবে, তাদের একজনের বেশি সন্তান জন্ম দেবার অধিকার আইন করে হরণ করা হোক। আর বেশি জন্ম দিলে সব সাহায্য বন্ধ করা হোক।

বাঙ্গালি সুখী ও আঁতেল। অঙ্কও করে না, তেমনি প্রশ্নও করে না!

—মৃণাল মজুমদার,
বার্লিন, জার্মানি।

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ভারতের উন্নয়ন, নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টান্ত স্থাপন

দেশের উন্নয়ন গণতন্ত্রের এক বিশেষ অগ্রগমন। ভারতবর্ষ অর্থনৈতিক ভাবে স্বনির্ভর ছিল। তার অন্যতম প্রধান কারণ বিকেন্দ্রীকরণের অর্থনীতি, স্বনির্ভর অর্থনীতি। সরকারের উপর নির্ভর করত না দেশবাসী। প্রতিটি গ্রাম ছিল স্বনির্ভর। ভারত থেকে লুটে নিয়ে যাওয়া সম্পদের পরিমাণ সন্ধানে ইন্টারনেট সার্চ করলে জানতে পারা যাবে ভারতবর্ষ থেকে ইংল্যান্ড কত টাকা লুণ্ঠন করেছে ২০০ বছরের শাসনে। আজকে যখন তাদের লুণ্ঠন করা শেষ হয়েছে, আর কোথাও লোটার জায়গা নেই, তাদের অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে। আজকে গ্রিসকে ভিক্ষার পাত্র নিয়ে দেশে দেশে ঘুরতে হচ্ছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ অর্থনৈতিকভাবে ধুঁকছে। আমেরিকাকে ভাবতে হয়েছে কীভাবে অর্থনীতিকে সামাল দেবে করোনা পরিস্থিতিতে। সেখানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী এই কঠিন পরিস্থিতিতেও ২০ লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করেন।

বর্তমানে পরমাণু অস্ত্রে পাকিস্তানকে টপকেছে ভারত, অন্যদিকে ৫০০ বছরের রামমন্দির-বাবরি মসজিদ সমস্যার আইনি সমাধান এ এক ঐতিহাসিক সনাতনি বিজয়, আবার অপার অসীম জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রবিন্দু নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্নির্মাণ। এই ঐতিহাসিক ঐতিহ্য ও গৌরবগাথা স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাস ধারণ করে রাখবে— একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

—রবীন্দ্রনাথ রায়,
সাহেবের হাট, রাশিডাঙ্গা,
কোচবিহার।

দ্বারকা : প্রাচীন ভারতের প্রবেশদ্বার

ইতিহাস অনুসারে, গুজরাটের ইতিহাস জানা যায় আজ থেকে ৪ হাজার বছর আগে। কথিত যে, এই সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উত্তর ভারতের মথুরা ত্যাগ করে ভারতের পশ্চিম উপকূলে সৌরাষ্ট্রে এসে রাজধানী স্থাপন করেন। পরে যা দ্বারকা নামে বিখ্যাত হয়। উল্লেখ্য, এই নগরীতে প্রবাহিত গোমতী নদী আরব সাগরে মিলিত হয়েছে। দ্বারকার দক্ষিণে রয়েছে গোমতী আর পশ্চিমে রয়েছে আরব সাগর। প্রাকৃতিকভাবে জলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো ছিল।

বর্তমান ভারতের প্রবেশদ্বার হচ্ছে মহারাষ্ট্রের মুম্বাই নগরী। এখানেই রয়েছে বিখ্যাত গেটওয়ে অব ইন্ডিয়া। অর্থাৎ আধুনিক ভারতের প্রবেশদ্বার। বিভিন্ন দেশের জাহাজ সবচেয়ে বেশি এখানেই ভিড়ে। তাই আজকের প্রবেশদ্বার মুম্বই।

ফঃ ৩

আবার দ্বারকা শব্দ বা নামের অর্থ হচ্ছে প্রবেশদ্বার। সংক্ষিপ্ত রূপ 'দ্বার' বা 'দ্বারকা'। বর্তমান দ্বারকার কাছে আরব সাগরের তলদেশে প্রাচীন দ্বারকার ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। সমুদ্রবিজ্ঞানী ও পুরাতত্ত্ববিদদের মতে এই নগরীর প্রাচীনতা প্রায় ৯ হাজার বছর। সরাসরি এমন প্রমাণ নেই যে, বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যিক জাহাজ এখানে ভিড়ত। তবে উল্লিখিত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং দ্বারকা নাম পরোক্ষভাবে বলছে, প্রাচীন ভারতের প্রবেশদ্বার দ্বারকা। আশাকরি, ভবিষ্যতে এই প্রসঙ্গে আরও তথ্য উঠে আসবে।

—রাজকুমার জাজোদিয়া,
কালিয়াগঞ্জ।

গণতন্ত্র বনাম জেহাদ

শিক্ষা ও অভিজ্ঞতায় জেনেছি, পৃথিবীর মধ্যযুগীয় ও জেহাদি চিন্তাভাবনায় আগাগোড়া পুষ্ট মানুষজন এবং অন্যদিকে সর্বহারার বুলি কপচানো কমিউনিস্টরা মনুষ্যত্ব নামক সুগন্ধিতে বিশ্বাসী নয়। যদিও মুখে জনদরদি এবং শান্তির বাণী বর্ষণ করে এক প্রকার Defensive Mechanism-এর কৃত্রিম সুগন্ধ ছড়ায়। অবাক করা ব্যাপার হলো, এরা উভয়ই মুখোমুখি সংঘর্ষ যথাসম্ভব এড়িয়ে চলে এবং অপেক্ষাকৃত একে অন্যের অধিক শক্তির কাছে আপন আপন বশ্যতা স্বীকারও করে নেয় অতি সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে। পরিবর্তনশীল পৃথিবীর পরিবর্তিত গতিশীলতায় আস্থা বড়োই কম, বিশেষ করে চেতন ও মননে।

যেহেতু এদের wave of thinking বড্ড বেশি গা ঘেঁষাঘেঁষি, তাই তাদের প্রাচীনপন্থী অনড়তা যেন মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। মনে মনে যাই থাক না কেন, মুখে খুব মিল। যদি পৃথিবীতে কোনোদিন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাঁধে, তবে এপি-সেন্টার হয়তো হবে মধ্যপ্রাচ্য। যাকে এপিজে আব্দুল কালাম থেকে শুরু করে অসংখ্য গুণী মানুষজন বলে থাকেন যুদ্ধভূমি/বধ্য ভূমি। তখন পৃথিবীর জেহাদি চিন্তাভাবনা পুষ্ট দেশগুলি নিজেদের মধ্যে আঁতাত করে, কমিউনিস্ট দেশগুলিকে সঙ্গে নিয়ে মানবতার শত্রুরূপে হয়তো আত্মপ্রকাশ করার সম্ভাবনা থাকবে। অন্যদিকে থাকবে পৃথিবীর বাকি যত গণতন্ত্রকামী দেশসমূহ। অতি সম্প্রতি ইজরায়েল লেবাননের সন্ত্রাসবাদী হিজবুল্লাহ গোষ্ঠীর ডেরায় হামলা চালিয়েছে। আবার হিজবুল্লাহ স্মার্ট বম্ব দিয়ে ইজরায়েলের ওপর হামলা চালায়। সম্ভাব্য বড়োসড়ো যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এদিকে সৌদি আরব, আমেরিকা, জার্মানি-সহ বহু দেশ লেবানন থেকে আপন আপন নাগরিকদের সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। জার্মানি তো প্রকাশ্যেই ইজরায়েলকে বাঁচানোর জন্য আবেদন জানিয়েছে। আবার ইরান, তুরস্ক প্রভৃতি ধর্মীয় কট্টরপন্থী দেশ প্যালেস্তাইনের হাত ধরে লেবাননের পাশে দাঁড়িয়েছে।

ফলে তুরস্ককে ইউরোপের দেশ বলে মনে করতে এখন উন্নত ইউরোপিয়ন ইউনিয়নের প্রবল অনীহা। যদি ধরেই নিই, মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ দেশই সিভিলাইজড অর্থাৎ সভ্য, তাহলে হুথি, হামাস, হিজবুল্লাহের মতো জঙ্গি সংগঠন কীভাবে ঘাড়ে এ কে-৪৭ নিয়ে প্রকাশ্যে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে? তাও আবার সরকারের নাকের ডগায়? ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, কিংবা ইংল্যান্ড, আমেরিকা, জার্মানি, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়াতে কোনো জঙ্গি সংগঠন কী এভাবে সশস্ত্র হয়ে প্রকাশ্যে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে? সরকারের নাকের ডগায়? তাহলে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিকে কী সিভিলাইজড বলা যুক্তিসঙ্গত?

অনেকেরই মনে প্রশ্ন, তাহলে কী পৃথিবী আবার বিশ্বযুদ্ধের দিকে এগোচ্ছে? মানে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ? মজার ব্যাপার হলো, জেহাদে, নিষ্ঠুরতায় এবং ধ্বংসে আস্থাশীল এসব দেশগুলো মুখে গণতন্ত্রের বুলি, শান্তির বুলি কপচালেও কর্মক্ষেত্রে তারা অবশ্যই গণতন্ত্র বিরোধী। ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। কোনো দেশে এরা একবার শাসনক্ষমতা কুক্ষিগত করতে পারলেই সেখানে গণতন্ত্র সমাধি লাভ করে। যেমন লেবানন গত শতাব্দীর প্রথমদিকে ছিল মধ্যপ্রাচ্যের একমাত্র খ্রিস্টান অধ্যুষিত গণতান্ত্রিক দেশ। তখন তাকে বলা হতো 'Switzerland of the East. সারা বিশ্ব থেকে পর্যটকরা লেবাননের রাজধানী বেইরুট এসে বলতো, এটা আমাদের কাছে Paris of the Middle East. তাছাড়া সামগ্রিক উন্নয়ন সূচকে তখন লেবানন ছিল অনেক ওপরের সারিতে। পাশাপাশি গণতন্ত্রের সার্থক প্রতিরূপ ছিল লেবানন। আর এখন মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঘোষিত হয়েছে ইসলামিক দেশ। এতে কতটুকু ভালো হলো বা কতটুকু খারাপ, সেটা মূল্যায়নের ক্ষমতা ধর্মীয়ভাবে কট্টর মানুষদের নেই বললেই চলে। ফলে এখন সেখানে জেহাদি কার্যকলাপ স্বাভাবিক ভাবেই চলে এসেছে।

সন্ত্রাস ও মৃত্যু তাদের একমাত্র লক্ষ্য। এদের সমাজ পরিবর্তনে কোনো ভূমিকা নেই। Believe it or not, it's the ground reality, এজন্যই তো জেহাদিদের সুরে সুর মিলিয়ে, মনুষ্যত্বের ঠিক উলটো সুরে কমরেড জোসেফ স্তালিনকে বলতে শুনি, — 'Death is the only solution of all problems'। মাও-সে-তুং বলেন, 'জনগণই বন্দুকের নল, বন্দুকের নল থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্ম হয়'। কাজেই এজাতীয় মনন ও চিন্তনকে মানবতাবিরোধী, মনুষ্যত্ববিরোধী বলা কী অযৌক্তিক?

—নারায়ণ শঙ্কর দাস,
ইসলামপুর, উত্তরপাড়া, দিনাজপুর।

With Best Compliments from -

A
Well wisher

স্থূলতা সমাজের একটি ভয়ংকর সমস্যা

সুতপা বসাক ভড়

বর্তমানে আমাদের দেশ একটি আপাতনিরীহ অথচ ভয়ংকর শারীরিক সমস্যার মধ্য দিয়ে চলছে— একদিকে সমগ্রদেশে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান অপুষ্টি, অপরদিকে স্থূলতা। দুটি সমস্যাই প্রখর, সর্বব্যাপী এবং খুবই সঙ্কটজনক অবস্থায় রয়েছে। স্থূলতার সমস্যা যুবসমাজ ও মহিলাদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান। গ্রাম্য মহিলাদের মধ্যে গত দশকের তুলনায় স্থূলতা দ্বিগুণ বেড়ে গেছে এবং নিম্নবিত্তদের মধ্যে পরিস্থিতি আরও সঙ্কটজনক।

স্থূলতার জন্য হার্টঅ্যাটাক, স্ট্রোক, টাইপ-টু ডায়াবেটিসের মতো অসুখ শরীরে বাসা বাঁধছে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের জীবনযাত্রার প্রতিফলন ঘটে আমাদের চেহারায়। সুষম খাদ্য ও ব্যায়ামের দ্বারা আমরা এই সমস্যা থেকে অনেকটাই মুক্তি পেতে পারি। আমাদের সমাজের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি— খাদ্য, কাজের ধরন, জীবনশৈলী ইত্যাদি স্থূলতার জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। জীবনে একাকিত্ব, যাতায়াতের জন্য পরিবহণের অত্যধিক ব্যবহার, টিভি, ল্যাপটপ, মুঠোফোন ইত্যাদির প্রতি দিনের অধিকাংশ সময় ব্যতীত করার যে প্রবণতা, তার প্রত্যক্ষ ফল হলো স্থূলতা। এছাড়া আমাদের খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তনও এর অন্যতম কারণ। প্রায় সমগ্র ভারতে খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন লক্ষণীয়। আমাদের দেশের খাদ্যতালিকাতে সুষম খাদ্যের স্থান ছিল, কিন্তু প্রক্রিয়াজাত, প্যাকেটবন্দি খাবারে গত দুই দশক ধরে বাজার ছেয়ে গেছে। ফলস্বরূপ, অনাবশ্যক ক্যালোরি শরীরে ঢুকছে, অথচ পুষ্টির অভাব প্রকট।

আরও কিছু কারণ আছে, যেমন আমাদের পৌষ্টিকতন্ত্রে কিছু প্রাকৃতিক সূক্ষ্ম ও অতিসূক্ষ্ম অণুজীব আছে, যা আমাদের খাদ্য শোষণ, পাচন, স্থূলতা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে সহায়তা করে থাকে। কিন্তু আমাদের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের ফলে ওই অণুজীবগুলির অস্তিত্ব ও ক্রিয়াশীলতা ক্রমহ্রাসমান। ফলে আমাদের শরীরে স্থূলতা জনিত কারণে অনাবশ্যক ওজন বৃদ্ধি হচ্ছে। আমাদের ঘুমের সময় কমে আসছে। পর্যাপ্ত ঘুম না হওয়াও ওজন বৃদ্ধির একটি অন্যতম কারণ, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অপব্যবহার করে আমরা ঘুমের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে টিভি, ল্যাপটপ, মুঠোফোনে আসক্ত হয়ে থাকি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আমাদের টেনশন— দুশ্চিন্তা। দীর্ঘসময় ধরে এমন চলতে থাকলে আমাদের খিদে বাড়ানোর হরমোন নিঃসরণ বৃদ্ধি পায়। আমাদের বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জোর করে দেখানো হচ্ছে যে, মাঝরাতে উঠে ফ্রিজ খুলে খাবার খাওয়ার মধ্যে খুব আনন্দ। আবার, প্রচুর অর্থব্যয় করে নামি-দামি হোটেল-রেস্টুরেন্টের যেসব খাবার খেতে আমরা খুব ভালোবাসি, সেগুলো বেশিরভাগই অত্যাবশ্যক ক্যালোরিতে ভরপুর কিন্তু পুষ্টিবিহীন। এরপর আসে প্যাকেট অথবা বোতলবন্দি পানীয়, যা আমাদের আরও স্থূলতার দিকে ঠেলে দেয়।

একটু সচেতন হলে আমরা দেখতে পাব যে সমাজে সম্পূর্ণ অব্যবস্থা আনার জন্য কাজ করে চলেছে বিশ্বব্যাপী একটি বাণিজ্যচক্র। প্রথমে প্রক্রিয়াজাত, প্যাকেটবন্দি খাদ্য, এর পরেই প্যাকেট অথবা বোতলবন্দি পানীয়— এইভাবে চললেই আমরা নিজেদের অত্যাধুনিক প্রমাণ করতে পারব। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই ধারণা সকল স্তরের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্য তারা বদ্ধপরিকর। গত দু'দশক ধরে সকলরকম পরিবর্তন মূলত বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে করা হয়েছে। অর্থব্যয় করে আমরা ওইসব অখাদ্য-কুখ্যাদ্য খাব, তারপর অসুস্থ হবো এবং চিকিৎসার জন্য আবার বিপুল ব্যয়ভার অবশিষ্ট জীবনের সঙ্গী হবে— এই তো আমাদের সমাজের বর্তমান স্থিতি।

আমাদের যুবসমাজ খুব সহজেই নতুন কিছুতে আকৃষ্ট হয়ে থাকে; সময়, শক্তি, অর্থ ব্যয় করে দুর্বল শরীর এবং পরবর্তীকালে আরও দুর্বল সন্তানের জন্ম দেবে। সামগ্রিকভাবে একটি দেশকে দুর্বল করে করে দেওয়ার আন্তর্জাতিক চক্রান্তের জালে আমরা জড়িয়ে পড়ছি। এখনও সময় আছে, পথ আছে। সেজন্য আমাদের পারম্পরিক খাদ্যাভ্যাস, জীবনশৈলী, যা চিরকাল সমগ্র বিশ্বকে সঠিক দিশা দেখিয়েছে, সেখানে ফিরে যেতে হবে।

আমরা মহিলারা পরিবারের খাদ্যাভ্যাসের দিকে সুচিন্তিতভাবে দৃষ্টিপাত করতে পারি। বিশাল ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের খাদ্য আমরা আমাদের খাদ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করতেই পারি। আমরা জানি যে, সম্প্রতি করোনার মতো ভয়াবহ একটি সংক্রামক ব্যাধির উৎস ছিল কুখাদ্যাভ্যাস। সেজন্য সময় থাকতে আমরা সচেতন হব। পারম্পরিক, পুষ্টিকর, সুষম খাদ্যাভ্যাসে ফিরে যাব। টিভি, ল্যাপটপ, মুঠোফোন ইত্যাদির বাইরে আমাদের সামাজিক জীবনের প্রতিও আমাদের দায়বদ্ধতা আছে। এছাড়া আছে আমাদের পারম্পরিক, ঐতিহ্যপূর্ণ, কল্যাণময়ী যোগবিজ্ঞান— যার নিয়মিত অভ্যাসের দ্বারা আমরা সকলে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারি। মহিলারা তাঁদের কল্যাণময়ী ভূমিকার দ্বারা এই কাজে অগ্রণী ভূমিকা নেবেন— এমনটাই বাঞ্ছনীয়। □

শরীর ঠিক রাখতে আম খেতে পারেন

রিংকি ব্যানার্জি

আম আমাদের সবার পছন্দের ফল। দেখতে যেমন সুন্দর, খেতেও তেমন সুস্বাদু। কাঁচা হোক বা পাকা, আম মানুষের শরীরের জন্য খুব উপকারী। অনেকক্ষেত্রে পাকা আমের চেয়ে কাঁচা আমের বেশি গুণাগুণ রয়েছে। তবে পুষ্টিবিদদের মতে দু'ধরনেরই আম খাওয়া ভালো। কাঁচা ও পাকা আমের গুণাগুণ জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

আমের গুণাগুণ

ওজন কমাতে চাইলে কাঁচা আম খেতে পারেন। আম হজমশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। শরীর ফিট রাখে, দেহের শক্তি বাড়ায় ও ক্ষয় রোধ করে। উচ্চ পরিমাণে প্রোটিন থাকায় রোগ প্রতিরোধ করে। আম পুরুষের শুক্রাণুর গুণমান ভালো রাখে। লিভারের সমস্যায় কাজ দেয়। সন্তান সম্ভবা মায়েদের আয়রনের ঘাটতি পূরণ করে। পেটের সমস্যা কমায়। এছাড়া ত্বককেও সুন্দর করে। আম দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়। শরীরে নতুন রক্ত তৈরি করে, রক্তপাত রোধ করে। ক্যানসারের মতো মারাত্মক রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। গরমে অতিরিক্ত ঘামে শরীর থেকে সোডিয়াম ক্লোরাইড ও আয়রন বের হয়ে যায়। কাঁচা আমের জুস শরীরে এই ঘাটতি পূরণ করে। রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে কাঁচা আম শরীরের জন্য দরকারি। ভিটামিন 'সি' জোগাতে পারে। স্কার্ভি রোগ ও মাড়ির রক্ত পড়া কমায়। আমচুর চর্মরোগের জন্য ভালো। কাঁচা আমে পটাশিয়াম থাকার কারণে তা শরীরকে ঠাণ্ডা রাখতে সাহায্য করে। এ কারণে শরীরে ঘাম কম হয়। গরমে ক্লান্তি দূর হয়। আমে প্রচুর পরিমাণে গ্যালিক অ্যাসিড থাকার কারণে তা হজমে সাহায্য করে। গরমের সময় ঘামাচি একটি অস্বস্তিকর সমস্যা। ঘামাচির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সবচেয়ে ভালো উপায় নিয়মিত কাঁচা আম খাওয়া। কাঁচা আমে এমন কিছু উপাদান রয়েছে, যা সানস্ট্রোক প্রতিরোধ করে। যকৃতের রোগ নিরাময়ের প্রাকৃতিক বন্ধু স্বরূপ কাজ করে কাঁচা আম। কয়েক টুকরো কাঁচা আম নিয়মিত খেলে পিত্তরস বাড়ে। এতে যকৃত ভালো থাকে। খাবার হজমে সাহায্য করে কাঁচা আম। অন্ত্রকে পরিষ্কার করে ও কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি দেয়। কাঁচা আম টুকরো করে লবণ মাখিয়ে মধু দিয়ে খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়।

আমের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান

আমের আঁশে কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়েছে। যেমন ভিটামিন, মিনারেল ও অ্যান্টি অক্সিডেন্ট। রয়েছে প্রচুর পরিমাণে এনজাইম। আমে প্রায় ২৫ রকমের নানা উপকারী ক্যারোটিনয়েডস্ রয়েছে, যা আমাদের ইমিউন সিস্টেম বা রোগপ্রতিরোধী ব্যবস্থাকে ঠিক রাখে। আমে রয়েছে অ্যান্টি অক্সিডেন্টস্— ভিটামিন-এ, ভিটামিন ই এবং সেলেনিয়াম। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন প্রকার অ্যাসিড।

আম কখন খাবেন, কীভাবে খাবেন

সারাদিনের কাজ শেষে কাঁচা আমের শরবত খেতে পারেন। পাকা ও কাঁচা আমের জুস খেতে পারেন। উপবাসের সময় আমের শরবত খুব উপকারী। আমের মরসুমে প্রতিদিন এক কাপ পরিমাণ শরবত খেতে পারেন। কাঁচা আম তরকারিতে খেতে পারেন। অতিথি আপ্যায়নে আম রাখতে পারেন।

সতর্কতা

কথায় রয়েছে বেশি কোনও কিছু ভালো নয়। কাঁচা আম খাওয়ার ক্ষেত্রেও বিষয়টা মনে রাখতে হবে। বেশি পরিমাণ কাঁচা আম খেলে ডায়রিয়া হওয়ার আশঙ্কা থাকে। আমের কষ মুখে লাগলে ও পেটে গেলে মুখ, গলা ও পেটে সংক্রমণ হতে পারে। তাই এ ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে। পাকা আমও বেশি খাওয়া ঠিক নয়। পাকা আমে পলিস্যাকারাইডস্ বা চিনির পরিমাণ বেশি থাকার ফলে শরীর খারাপ হতে পারে। যাঁদের ব্লাড সুগার রয়েছে, তাঁরা একেবারেই দূরে থাকুন পাকা আমের থেকে। কেননা রক্তের গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়িয়ে আম শরীরের ক্ষতি করতে পারে।

যাঁরা অ্যাজমাতে ভুগছেন, তাঁরা দরকারে কম আম খান। কিডনির সমস্যা যাঁদের রয়েছে, তাঁদের পক্ষেও বেশি আম খাওয়া উচিত নয়। পাকা আম বেশি খেলে ওজন বেড়ে যায়। বেড়ে যাবে রক্তের শর্করার পরিমাণ। আমের আরও কিছু উপাদান রয়েছে, যেমন ফাইটোকেমিকেল কম্পাউন্ড তথা গ্যালিক অ্যাসিড, ম্যাঙ্গিফেরিন, কাইনেটিন ও ট্যানিন বা কষ জাতীয় উপাদান। এসব ক্ষতিকর। রোগীরা চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে আম খাবেন। □

গুরু-শিষ্য

রামদাস স্বামী ও ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ

শিবাজী প্রসাদ মণ্ডল

আষাঢ়ী পূর্ণিমার তিথি সমগ্র হিন্দু সমাজের নিকট একান্ত মর্যাদার বিষয়। সমস্ত গুরু ও আচার্যদের শিষ্য পার্ষদরা নিজ নিজ আশ্রম, মঠ মন্দিরে এই তিথি উদ্‌যাপনের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। এর কারণ আষাঢ়ী পূর্ণিমা গুরুপূর্ণিমা হিসেবে প্রাচীনকাল থেকে মর্যাদার সঙ্গে পালন হয়ে আসছে। এই তিথিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন মহামুনি ব্যাসদেব, তিনি বেদের সংকলক এবং বিভাগকর্তা। শুধু তাই নয়, ব্যাসদেব ছিলেন বহু শাস্ত্রগ্রন্থের রচয়িতা। যে কারণে আমাদের দেশের পণ্ডিত, গুরু, আচার্যরা ব্যাসদেবকে আদি গুরু হিসেবে স্বীকার করেছেন।

স্বয়ং ভগবানকেও গুরুবরণ করতে হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্রের গুরু ছিলেন বশিষ্ঠমুনি। শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের গুরু ছিলেন সন্দীপনী মুনি, শঙ্করাচার্য গুরুরূপে স্বীকার করেছিলেন গোবিন্দপাদকে, শ্রীচৈতন্য কেশবভারতীকে, শ্রীরামকৃষ্ণ তোতাপুরীকে। স্বামী প্রণবানন্দজী গম্ভীরানাথকে।

গুরু শব্দটি ছোটো হলেও এর তাৎপর্য ব্যাপক, যিনি অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোর দিকে নিয়ে যান তিনিই গুরু; যিনি দীক্ষা বা সাধন প্রদানের দ্বারা আত্মদর্শন করান তিনিই গুরু, যিনি সত্য-অসত্য, নিত্য-অনিত্য, কর্তব্য-অকর্তব্যের পাঠ দেন তিনিই গুরু। ব্যক্তির মুক্তির জন্য যেমন ব্যক্তিগুরু হয়ে থাকেন আবার শত শত, হাজার হাজার বছরের প্রাচীন জাতির দিশাদর্শনের জন্য, মুক্তির জন্য তত্ত্ব, আদর্শ প্রতীক হিসেবে গুরুরূপে পূজিত হন। আবহমানকাল ধরে ত্যাগ, সংযম, পরাক্রমের প্রতীক গৈরিক পতাকা গুরু রূপে হিন্দু সমাজকে পথ প্রদর্শন করে চলেছে।

যখনই ক্ষাত্রশক্তির সঙ্গে ব্রহ্মতেজের মিলন ঘটেছে তখনই সফলতা এসেছে, সৌভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন হয়েছেন। যেমন--- চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে চাণক্যের মিলন; তেমনি শিবাজীর সঙ্গে গুরু রামদাস স্বামীর মিলন। গুরু-শিষ্য পরম্পরার অন্যতম উজ্জ্বল উদাহরণ সমর্থ স্বামী রামদাস ও ছত্রপতি শিবাজীর; ব্রহ্মতেজের সঙ্গে

ক্ষাত্রতেজের এক দৈব সংমিশ্রণ। ছত্রপতি শিবাজীর মধ্যে এক জন্মজাত বৈরাগ্য ছিল। জীবন প্রভাতেই তিনি ভক্তশ্রেষ্ঠ তুকারামের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পান। তুকারামের কীর্তন, ভক্তিভাবে শিবাজী এতটাই আকৃষ্ট হন যে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে, গৃহ ত্যাগ করে বনবাসীর জীবনযাপন করতে থাকেন। চিন্তাগ্রস্ত রাজমাতা জিজাবাঈ তুকারামকে সব কিছু জানালেন এবং সেই দিব্যপুরুষ অনেক তিরস্কার করে শিবাজীকে আবার ক্ষাত্রধর্মে প্রবৃত্ত করালেন। এটাই গুরুর সঠিক দিশাদর্শন। স্বরাজ স্থাপনে সহায়ক হবে এই বিবেচনা করেই সন্ত তুকারাম উপদেশ দিলেন শিবাজী যেন অতি শীঘ্র সদ্‌গুরু রামদাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

রামদাস স্বামীর নাম, তাঁর তীব্র বৈরাগ্য সংগঠন শক্তি, লোকসংগ্রহী ক্ষমতার কথা শুনে শিবাজী চাফলমঠে উপস্থিত হলেন; কিন্তু দর্শন হলো না। কারণ রামদাস স্বামী তখন অন্যত্র। মনবেদনা নিয়ে ফিরলেন শিবাজী; কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর একটি সুন্দর পত্র পেলেন— ছন্দাকারে লেখা পাত্রটি ছিল এমন—

নিশ্চয়েতে হিমাচল। আশ্রিত জন বৎসল।
প্রতিজ্ঞা তব অটল। শ্রীমন্ত যোগী।।
মন্ত্রিগণ ধার্মিক ও জ্ঞানী। বেশি কি বলিব আমি।
ধর্ম-স্থাপনের কাজ। কভু ভুলিবে না।।

শিবাজী তার ধর্মরাজ্য স্থাপনের কাজ যখন অনেকখানি সুদৃঢ় করছেন তখন সমর্থ স্বামী রামদাসের কাছে তাঁর দীক্ষা গ্রহণ স্বরাজ লাভের গতিকে আরও প্রবল করেছিল। ছত্রপতির অসীম সাহস, অদম্য ইচ্ছাশক্তি, অনবদ্য রণকৌশল এবং গুরুর সাহচর্য ও আশীর্বাদে তিনি তাঁর অভীষ্ট লাভ করলেন। এক ধর্মরাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দেওয়ার প্রাথমিক ধাপ হিসেবে ১৬৭৪ সালে রায়গড়ে শিবাজীর রাজাভিষেক হলো। গুরুর পথনির্দেশ ও শিষ্যের সমর্পণ ভাব ফুটে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের 'প্রতিনিধি' কবিতার ছত্রে ছত্রে।

রাজার গুরুদেব পথে পথে ভিক্ষা করবে? এ দৃশ্য শিবাজীকে ব্যথিত করে তুলেছিল। বিশ্বস্ত অনুচর বালাজীর মাধ্যমে শিবাজী এক দলিলে স্বাক্ষর করে তাঁর সমস্ত রাজ্য গুরু রামদাস স্বামীকে গুরুদক্ষিণা হিসেবে অর্পণ করলেন। শিষ্যের মনের অবস্থা ও তার সঠিক দিশা দর্শনের জন্য রামদাস পরদিন রাজসভায় উপস্থিত হয়ে শিবাজীকে সিংহাসন ত্যাগ করে তাঁকে অনুসরণ করতে বললেন; কারণ সমস্ত কিছু দান করার পর শিবাজীর সিংহাসনে বসা অনুচিত। সারাদিন শিষ্য শিবাজীকে নিয়ে পথে পথে ভিক্ষা করে সন্ধ্যাকালে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করে তিনি শিবাজীর বোধোদয় ঘটালেন— সন্ন্যাসীর ধর্ম ও রাজার ধর্মের শিক্ষা দিলেন এবং আদেশ দিলেন যে একজন সন্ন্যাসীর প্রতিনিধি হয়ে, রাজ্যলয়ে রাজ্যহীন হয়ে লোককল্যাণের নিমিত্ত রাজ্যশাসন করার। তার সঙ্গে বললেন— বৈরাগীর উত্তরীয় তার রাজ্য পতাকা হবে। কেন বৈরাগীর উত্তরীয় রাজ্য পতাকা হবে? এই কারণে যে গৈরিক পতাকা ত্যাগ, সংযম, পরাক্রমের প্রতীক; সব সময় জাতিকে পথ দেখিয়ে এসেছে এবং আগামীতেও পথ দেখাবে। কখনো রাজাকে স্বৈরাচারী, ব্যাভিচারী, প্রজাপীড়ক হতে দেবে না। ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ গুরু রামদাসের এই উপদেশ আজীবন পালন করেছিলেন এবং সুশাসনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তাই গুরু-শিষ্য পরম্পরার এক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ গুরুরামদাস স্বামী ও ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ।

গুরু-শিষ্যা সংবাদ

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

কী অমূল্য উপহার দিয়ে গেছেন সিস্টার নিবেদিতা, Gift Box খুলে দেখেছি কি! এখনও তো ভারতবাসীর কাছে 'The gift unopened'। নানান প্রেক্ষাপটে তাঁর মূল্যায়ন হলেও, বস্তুবাদীরা তাঁকে Girls School-এর এক শিক্ষিকার চাইতে বড়ো পদমর্যাদা দেননি। কিন্তু নিবেদিতা প্রচার করে এদেশকে ভালোবাসেননি! আপন অন্তরাত্মার ডাকে এসেছিলেন, গুরুদেবের নির্দেশে তাঁর ভারত-জীবন শুরু করেছিলেন। 'বিশ্বের ঠাকুরঘরে' জীবনযাপন করতে এসেছিলেন। নিজেকে নৈবেদ্য রূপে নিবেদন করেছেন।

১৮৯৮ সালের ২৮ জানুয়ারি ইংল্যান্ড থেকে ভারতবর্ষে আসা। তখন অভুক্ত অথচ অতুল্য ভারত। বুভুক্ষু, মুমূর্ষু মানুষকে সেবা তো করলেনই, তার সঙ্গে নবজাগরণের অঙ্গরাগে ভারতীয় মেধার জগৎকে নাড়িয়ে গেলেন। রাজনীতি, সমাজ, শিল্প, শিক্ষা, বিজ্ঞান সবেতেই 'Green Manure'-এর মতো সার-জল জোগালেন। তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কবি মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন, বাঙ্গলার নবজাগরণের মাটিতে হলকর্ষণের পর বীজবপন হলো, বৃষ্টিপাতও হলো। দিকে দিকে নতুন অঙ্কুর দেখা দিল। তারই মধ্যে একটি বীজ সকলের থেকে দূরে এক কোণে অঙ্কুরিত হলো। নিজেকে ফুলে-ফলে বিকশিত করবার জন্য নয়। অন্য ফসলের সার হিসেবে ব্যবহার হবার জন্য। এই ফসল বাজার পর্যন্ত পৌঁছায় না। কেবল সার হবার ফসল।'

নিবেদিতা ভারতবর্ষকে মুক্তির পথ দেখানোর জন্য যে বিস্তৃত ক্ষেত্র খুঁজে পেলেন, তা স্বরাজ ভাবনার সর্বোত্তম দর্শন। কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, ভারতকে ভেতর থেকে জাগাতে হবে, অন্তরাত্মায় যে উৎকৃষ্ট সম্পদ অবহেলায় রয়েছে তা কর্ষণ করতে হবে। সমন্বয় করতে হবে মাণিক্য ভাণ্ডার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীঅরবিন্দ, জগদীশচন্দ্র বসু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন, মতিলাল ঘোষ, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল ঘোষ, অসিত কুমার হালদার, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, মোহিনী মোহন চ্যাটার্জী, গোপালকৃষ্ণ গোখলের মতো মনীষীদের সঙ্গে নানান বিদগ্ধ আলোচনায় ব্রতী হলেন।

নিবেদিতার শিক্ষাদর্শে আমরা ঋণী। জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনায় অগ্রদূত ছিলেন তিনি। ভারতবোধ সম্পন্ন শিক্ষাই যে আমাদের ভারতীয় করে তোলে, ইউরোপীয় শিক্ষা নয়, এটা পরিষ্কারভাবে জানতে পারলাম নিবেদিতার তত্ত্বে ভর করে। স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের অগ্রপথিক তিনি। তাঁর স্থাপিত বিদ্যালয় জাতীয় ধারায় নির্মিত প্রথম বিদ্যালয়। নারী শিক্ষার ব্যবস্থা ইউরোপীয় মিশনারি এবং ব্রাহ্ম চিন্তাবিদেরাও করেছেন। তাহলে নিবেদিতা নতুন কী করলেন? নিবেদিতা নারীশিক্ষার সুরটি বেঁধে দিলেন ভারতীয় সুকুমারী-আদর্শের সঙ্গে ইউরোপীয় দৃঢ়তা ও দৃষ্টিভঙ্গীর স্তম্ভে। এই উদ্যোগে কেবল কর্তব্যবোধের মধ্যে শেষ হবার নয়। প্রেম ও ব্যাকুলতা থাকতে হবে শিক্ষাদর্শনের পরতে পরতে, তবেই কর্মক্ষেত্রে গিয়ে মানুষের জন্য কাজ করতে পারা যাবে। জ্ঞানদান কেবল শিক্ষার সীমা নয়। কর্মকাণ্ডের অন্দরমহলে চাই ব্যাপকতা, নইলে বিদ্যা হচ্ছে 'শুষ্ক জ্ঞান'। নিবেদিতা সচেষ্ট হলেন বাগবাজারের অখ্যাত গলির মধ্যে অনন্য শিশুতীর্থ গড়ে তুলতে। হিন্দু সংস্কৃতি ও রীতিনীতিকে বজায় রেখে চলার মধ্যে রয়েছে দেশীয় হৃদয়ের উত্তাপ। এ তোতাপাখির খাঁচা নয়, এ বিরাটের কাকলি। যে নারী-পক্ষ কাটা হয়েছিল ইসলামিক শাসনে, অপরিসীম আনন্দে সেই পাখনা জুড়ে দেওয়ার কাজ শুরু করলেন নিবেদিতা।

ভারতবর্ষের দুঃখ দারিদ্র্যকে উপেক্ষা করে, এদেশের গ্রীষ্মপ্রধান জলবায়ুকে সহ্য করে, ইউরোপের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে হেলায় সরিয়ে রেখে তিনি ভারতবাসীর সেবা করলেন। ১৮৯৯ সালে কলকাতার প্লেগরোগ নিবারণে তাঁর কাজ আজও ভোলার নয়। নিজেই ঝাঁটা হাতে রাস্তার ময়লা পরিষ্কার করতে নেমেছেন। মুমূর্ষু রোগীদের নিজেই সেবা করছেন, বানভাসি, মন্বন্তর-দীর্ণ বরিশালে ছুটে

গেলেন। তিনি ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে আপোশহীন সংগ্রামী। শুধু আন্দোলনের জোয়ারে অবগাহন নয়, অর্থনীতিকে স্বাবলম্বী করতে স্বদেশি পণ্য উৎপাদন ও ব্যবহারের জন্যও মানুষকে প্রভাবিত করেছেন। বিপ্লবীদের উৎসাহ দিয়েছেন, বই দিয়েছেন, গোপন তথ্যও দিয়েছেন, দিয়েছেন বিপ্লবী কাজের অনুমোদন। সকল তথ্য হয়তো এখনও আমাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি।

ইংল্যান্ডে স্বামীজীর সঙ্গে যখন তার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে তখন তিনি আঠাশ বছরের পূর্ণ যুবতী আর স্বামী বিবেকানন্দ তেত্রিশের এক তরুণ সন্ন্যাসী। শিকাগোয় সফল অভিযানের পর ধর্মপ্রচারে এসেছেন ইউরোপে। মার্গারেট তখনই ইংল্যান্ডের এক প্রতিষ্ঠিত, সফল ব্যক্তিত্বসম্পন্না জনপ্রিয় শিক্ষাবিদ; বুদ্ধিদীপ্ত, স্বাধীন চিন্তার অধিকারিণী। কাজেই স্বামীজীর সামীপ্যে-সান্নিধ্যে এসে নিজের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য নিজেকে বদলাতে হয়নি তাঁর, বদলাতে হয়েছিল কেবল আদর্শকে, নিজের কর্মক্ষেত্রকে। স্বামীজী হয়ে উঠলেন তাঁর 'Master'; তিনি প্রভুর কাছে বলা ভালো, ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির কাছে 'আত্মসমর্পণ' করলেন।

ছিলেন মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল; হয়ে উঠলেন ভগিনী নিবেদিতা। ছিলেন খ্রিস্টান ধর্মযাজকের কন্যা; হয়ে গেলেন হিন্দু বিধবা সাধ্বী রমণীর আদরের 'খুকি'। ছিলেন ব্রিটিশ স্বাজাত্যবোধে অটুট নারী; হয়ে উঠলেন ভারতীয় জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের ব্যতিক্রমী অস্মিতা। এ যেন মার্গারেটের সত্তাকে একদম ভেঙেচুরে, বিসর্জন দিয়ে হয়ে ওঠা ভারতীয় সন্ন্যাসিনী। স্বামীজী এমন নারীকেই চেয়েছিলেন, 'ভারতের নারীসমাজের জন্য, পুরুষের চেয়ে নারীর— একজন প্রকৃত সিংহীর প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখনও মহীয়সী মহিলার জন্মদান করতে পারছে না, তাই

ছিলেন মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল; হয়ে উঠলেন ভগিনী নিবেদিতা। ছিলেন খ্রিস্টান ধর্মযাজকের কন্যা; হয়ে গেলেন হিন্দু বিধবা সাধ্বী রমণীর আদরের 'খুকি'। ছিলেন ব্রিটিশ স্বাজাত্যবোধে অটুট নারী; হয়ে উঠলেন ভারতীয় জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমর ব্যতিক্রমী অস্মিতা।

অন্য জাতি থেকে তাকে ধার করতে হবে।'

গুরুর প্রভাব সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'Suppose he had not come to London that time ! Life would have been like a headless dream ; for I always knew that I was waiting for something. I always said that a call would come. And I did.' আবাল্য ধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগ সত্ত্বেও চার্চের অধীনে প্রথাগত ধর্মজীবনে সম্পৃক্ত থাকলেও তিনি শান্তির সন্ধান পাননি। অসংখ্য পুস্তকে খুঁজেছেন ধর্মজীবনের সঠিক পথ। সেই পথ পেয়েছিলেন ভারতীয় হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যায়। বিশ্বাস করেছিলেন ভারতের কল্যাণই বিশ্বের কল্যাণ; ভারতের আধ্যাত্মিকতাই পরম পথ; ভারতবর্ষের সেবা মানেই সমগ্র মানবজাতির সেবা। রবীন্দ্রনাথের কথায়, 'নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য শক্তি আর কোনো মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই।' প্রবল ব্যক্তিত্বের বল ছিল তাঁর মধ্যে, যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'যোদ্ধৃত্ব' রূপ। নিবেদিতার এই তপঃশক্তিকে জানলে গুরু স্বামীজীর ভারতস্বপ্নকেও জানা সম্ভব হবে। যে ভারতবোধ, জাতীয়তাবোধকে তিনি জাগিয়ে তুলেছিলেন তা তিনি ভারতীয় হিসেবেই করেছেন, বিদেশিনী হিসেবে নয়। এক বিদেশিনী মহিলার ভারতীয় হয়ে উঠবার এই কাহিনি সভ্যতার ইতিহাসে বিরল রহস্যময় ঘটনা।

তথ্যসূত্র :

১. সুদক্ষিণা ২০১৫-২০১৬, জন্ম সার্ধশতবর্ষে ভগিনী নিবেদিতা, নন্দন মিলন বীথি, হরিণাভি, কলকাতা।

২. ভারতের নিবেদিতা, জুলাই ২০০২ (৫ম প্রকাশ), রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা।

৩. স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি, ১৪০৪ (দ্বাদশ পুনর্মুদ্রণ), ভগিনী নিবেদিতা, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা।

৪. ভারতের নিবেদিতা, দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত, দেশ, ১৭ ডিসেম্বর, ২০১৬ : ২৪-৩৩। ■

বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের বিবেকানন্দ সেবা সম্মান প্রদান

গত ৩০ জুন বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে স্থানীয় রথীন্দ্র মঞ্চে 'বিবেকানন্দ সেবা সম্মান, ২০২৪' প্রদান করা হলো। ত্রিপুরার জনজাতিদের উন্নয়ন ও সনাতনী সংস্কৃতি রক্ষায় সমর্পিত সমাজসেবী সংস্থা 'শান্তি কালী মিশন'-কে ৩৮ তম বিবেকানন্দ সেবা সম্মানে সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সুপ্রিম কোর্টের প্রবীণ আইনজীবী ড. পি.এন. মিশ্র। তিনি এবং অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্যরা জনজাতি কল্যাণে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ শান্তি কালী মিশনকে ১ লক্ষ টাকার সম্মানরাশি ও মানপত্র তুলে দেন। শান্তি কালী মিশনের তরফে পদ্মশ্রী স্বামী চিত্তরঞ্জন দেববর্মা মহারাজ এই সম্মান গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে ড. শম্ভুপ্রসাদ শ্রীবাস্তবের— 'প্রভু জীবন পথ মেঁ পুণ্য মিলে' গানটি শোনান জনপ্রিয় গায়ক সত্যনারায়ণ তেওয়ারি। সর্বশ্রী নন্দকুমার লোঢা, মহাবীর প্রসাদ রাওয়াত, অজয় চৌবে ও অরুণ প্রকাশ মল্লাওয়াত অনুষ্ঠানের সম্মাননীয় অতিথিদের মালা পরিয়ে অভ্যর্থনা জানান। স্বাগত ভাষণ দেন ড. তারা দুগড়। ৩৮তম বিবেকানন্দ সেবা সম্মান অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ছিলেন রাষ্ট্রবাদী চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদ ড. সরূপ প্রসাদ ঘোষ। তিনি বলেন যে বিভিন্ন মত, পথ, উপাসনাপদ্ধতি ও সংস্কৃতি ভারত ভূমিতে সম্মিলিত ও সমাহিত হয়েছে। ভারতের মাটিতে মিশে যাওয়া সকল উপাসনাপদ্ধতি সত্যের ওপরেই আধারিত। ভারতের মানবতাবাদী স্বরূপ সেই চিরন্তন সত্য আধারিত সকল মত, পথ ও পদ্ধতিকে একসূত্রে গ্রথিত করেছে। ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরা ও সাংস্কৃতিক চরিত্র 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'-এর ধারণা আধারিত। দেশীয় পরম্পরা ও সংস্কৃতি রক্ষায় সকল ভারতীয়কে সংকল্পবদ্ধ ও নিষ্ঠাবান হয়ে উঠতে হবে বলে তিনি জানান। অনুষ্ঠানের সভাপতি ড. পি.এন. মিশ্র বলেন যে ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে স্বামীজী যে বাণী, উপদেশ প্রদান করে গিয়েছেন, সেই শিক্ষা দেশ ও সমাজের জন্য চিরকালীন পথপ্রদর্শক। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতি রক্ষায় শান্তি কালী মিশনের ভূমিকা ও প্রয়াসের বিশেষ প্রশংসা করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন কুমারসভা পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ মহাবীর বাজাজ। সীতারাম তেওয়ারির স্বস্তি বাচন মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে রিমা সিংহ, রূপা কুণ্ডু, বংশীধর শর্মা, ড. সরূপ প্রসাদ ঘোষ, ভগীরথ চাণ্ডক ও ড. পি.এন. মিশ্র পূজ্যপাদ স্বামী চিত্তরঞ্জন মহারাজকে সম্মানে ভূষিত করেন। বিবেকানন্দ সেবা সম্মান গ্রহণের পর মহারাজ বলেন যে সনাতন ধর্ম এবং জনজাতিদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের লক্ষ্যে শান্তি কালী মিশন স্থাপিত হয়েছে। আশ্রম স্থাপন থেকে শুরু করে সেবা কাজ সংগঠনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অসংখ্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন

হতে হলেও সেই সব কিছুর সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করে ২০ বছর ধরে ১৩টি ছাত্রাবাস ও ৩৫টি মন্দিরের মাধ্যমে সেবা কেন্দ্রগুলি পরিচালিত হচ্ছে। এই কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে এখনও পর্যন্ত ৪০০০ ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষাগ্রহণ করেছে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কুমারসভা পুস্তকালয়ের উপাধ্যক্ষ ভাগীরথ চাণ্ডক।

সাগরমল গুপ্তা, মোহনলাল পারীক, মীনাদেবী পুরোহিত, দয়াশঙ্কর মিশ্র, পবন ধেলিয়া, ড. মহেশ মাহেশ্বরী, ভাগীরথ কাঙ্কানী, অজয়েন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, চম্পালাল পারীক, অনিল মল্লাওয়াত, কিশন ঝাওয়ার, সঞ্জয় রাস্তোগী, মনোজ পরাশর, স্নেহ কুমার, ব্রহ্মানন্দ বংগ, ঘনশ্যাম চৌরাসিয়া, মনীষ জৈন, রামচন্দ্র আগরওয়াল, ড. কমল কুমার, শ্রীরাম সোনি, মহেশ মোদী, জীবন সিংহ, রামপুকার সিংহ, অশোক গুপ্তা, শ্রীমোহন তেওয়ারি, রমাকান্ত সিনহা, পরমজিত পণ্ডিত, দীক্ষা গুপ্তা, অরবিন্দ তেওয়ারি, সর্বদেব তেওয়ারি, বালকিষণ লুন্ডিয়া, আদিত্য বিনানী, মুকেশ সিংহ, মদনলাল বোথরা, প্রদীপ সুঠওয়াল, জগমোহন খান্ডেলওয়াল, কিষণ কুমার খাণ্ডেলওয়াল, সঞ্জয় মণ্ডল, সুনীল হর্ষ, গোবিন্দ জৈথলিয়া, রবিপ্রতাপ সিংহ, তেজবাহাদুর সিংহ, রবীন্দ্র শ্রীবাস্তব, সীমা রাস্তোগী, মহেশ মালপাণী, রুদ্রকান্ত ঝা, অশোক রায়, গায়ত্রী বাজাজ প্রমুখ কলকাতা ও হাওড়ার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের বিশিষ্ট জনেরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সক্রিয় ছিলেন— ভগীরথ সারস্বত, মনোজ কাকড়া, গুড্ডন সিংহ, রাজু লাঠ, বিপুল দুগড়, অরুণ সিংহ প্রমুখ।

ক্রীড়া ভারতীর উদ্যোগে বিশ্ব যোগ দিবস পালন

গত ২১ জুন দশম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষ্যে ধর্মতলার রানি রাসমণি রোডে ক্রীড়া ভারতী, কলকাতা মহানগরের তত্ত্বাবধানে যোগ দিবসের ভব্য কার্যক্রম আয়োজিত হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয় ও সংস্থা থেকে প্রায় ২,০০০ ছাত্র-ছাত্রী যোগ দিবসের এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। কার্যক্রমে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রী ও অন্যদের উদ্দেশে যোগের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করে অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ-সরকার্যবাহ রামদত্ত চক্রধর বলেন, নিজেদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য শুধুমাত্র এই দিনটি ছাড়াও সবার প্রত্যহ যোগাসন করা উচিত।

যোগ দিবসের এই কার্যক্রমে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য অদ্বৈতচরণ দত্ত, দক্ষিণবঙ্গ পান্ত সঙ্ঘচালক জয়ন্ত পাল, কলকাতা মহানগর সঙ্ঘচালক রমেশ সরাওগী, ক্রীড়াভারতীর বিশ্বজিৎ পালিত ও মধুময় নাথ। কার্যক্রমটি সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট যোগ শিক্ষক অভিজিৎ ঘোষ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সঞ্জয় মণ্ডল। যোগাসনের মূল কার্যক্রমটি পরিচালনা করেন যোগ শিক্ষিকা কিরণ চৌরাসিয়া এবং যোগ প্রশিক্ষক প্রণব সিহি।

যোগ দিবসের এই কার্যক্রমকে সফল করে তুলতে সঙ্ঘের কলকাতা মহানগর কার্যবাহ বিভাস মজুমদার, ক্রীড়া ভারতীর জয়ন্তী মণ্ডল সরকার, পুনম গোণ্ড, ঘনশ্যাম চৌরাসিয়া, গোপাল সিংহ, ব্রজেশ ঝা, নীলেন্দু ভট্টাচার্য, দীপ দে, শুভরাজ ঘোষ, প্রবীর পাল, সঞ্জয় সিংহ, তারক দাস, দেবাশিস প্রামাণিক, বিজয় ঝা, গোপাল মণ্ডল, রাকেশ সিংহ, সুনীতা কুমারী, ধর্মেন্দ্র সিংহ, অজিত বর্মা, বিকাশ সিংহ, সৌরভ উপাধ্যায় প্রমুখ কার্যকর্তা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে অধ্যাপক হরিপদ ভারতীর ১০৪তম জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের শ্রীনাথ প্রেক্ষাগৃহে অধ্যাপক হরিপদ ভারতীর ১০৪তম জন্মজয়ন্তীর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় গত ২৮ জুন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী (দিলীপ মহারাজ)। তিনি অধ্যাপক ভারতীর চিত্রে মাল্যার্পণ করে তাঁর স্মৃতিচারণ করে বলেন যে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সঙ্গে হরিপদ ভারতীর একটি নিবিড় সম্পর্ক ছিল। সকলকে তিনি হরিপদ ভারতীর আদর্শিত পথে চলার জন্য আহ্বান জানান। আবেগঘন মুহূর্তে উদ্যোক্তাদের বলেন অধ্যাপক ভারতীর জন্মদিন প্রতি বছর যেন এই ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রাঙ্গণে উদ্‌যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল হরিপদ ভারতী স্মৃতিরক্ষা সমিতি। অনুষ্ঠানে অনেক সাধুসন্তের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। উপস্থিত ছিলেন হরিপদ ভারতীর ভ্রাতুষ্পুত্র প্রবীর ভারতী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন হরিপদ ভারতী স্মৃতিরক্ষা সমিতির সম্পাদক রোমিত ঘোষ।

সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ আয়োজনে ‘নমামি গঙ্গে’

গত ৩০ জুন কলকাতার মানিকতলার ৫০, বলদেওপাড়া রোড-স্থিত দ্বিতল ভবনের ‘কলা স্যন্দন’ সভাকক্ষে সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে ‘ভারতীয় সংস্কৃতি ন্যাস’ নিবেদিত ‘নমামি গঙ্গে’ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট সমাজসেবী ড. কল্যাণ চক্রবর্তী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতীর কেন্দ্রীয় সমিতির অন্যতম সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা রায়, কেন্দ্রীয় কোষটোলির সদস্য ভরত কুণ্ডু এবং সংস্কার ভারতীর অন্যান্য সদস্য-সদস্যা। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এরপর আয়োজকদের পক্ষ থেকে অধ্যাপক চক্রবর্তীকে ফুল, মিষ্টি ও উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। অধ্যাপক চক্রবর্তী তাঁর ভাষণে বলেন, ‘গঙ্গাকে আমরা মাতৃজ্ঞানে পূজা করি। কিন্তু সেই মা-কেই আমরা আমাদের বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে— কখনও পুজোর ফুল, প্লাস্টিক সামগ্রী, বিভিন্ন মৃতপশু, কারখানার বর্জ্য, কৃষিকাজে ব্যবহৃত কীটনাশক ধোয়া জল ইত্যাদির মাধ্যমে দূষিত করে চলেছি। আমরা যদি মা গঙ্গাকে বিশুদ্ধ না রাখি তাহলে ভবিষ্যতে আমরা পানীয় জলসংকটে ভুগব এবং নিজেদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলবো। তাই সবাই এগিয়ে আসুন, আমরা সবাই মিলে মা গঙ্গাকে পরিষ্কার রাখবো এবং পরিষ্কার রাখার জন্য অন্যদেরও সচেতন করবো— এই প্রতিজ্ঞা আজ এই সভামঞ্চ থেকে করি’। শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায় বলেন, ‘গঙ্গামা-কে মর্ত্যে আনার জন্য ভগীরথ কঠোর তপস্যা করেছিলেন। আজ গঙ্গাকে মর্ত্যে স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ রাখার জন্য আমাদের তপস্যা করতে হবে’। অনুষ্ঠানে ভাবসংগীত ও ‘গঙ্গার গান’ পরিবেশন করেন অজন্তা রায়, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমা বসু, সুনীতা রায় কর্মকার, রূপা দে ও আশা বসাক। গঙ্গামাহাত্ম্য বর্ণনা করেন প্রমিতি রায় ও সঞ্চিতা সরকার। বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী মিলন খামারিয়া। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রান্তের অন্যতম সম্পাদিকা মহাশ্বেতা চক্রবর্তী। দোলন চক্রবর্তীর শান্তিমন্ত্র পাঠের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়। অনুষ্ঠানটির সার্বিক আয়োজনে ও ব্যবস্থাপনায় ছিলেন উত্তর কলকাতা জেলার কোষাধ্যক্ষ পার্থসারথি চক্রবর্তী।

শ্রীরামপুর সরস্বতী শিশু মন্দিরে রক্তদান কর্মসূচি

গত ১৬ জুন হুগলী জেলার শ্রীরামপুর সরস্বতী শিশু মন্দির কর্তৃপক্ষ এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। শিবিরে ৬০ জন রক্ত দান করেন। শিবিরে উপস্থিত থেকে রক্তদাতদের উৎসাহিত করেন ডাঃ পঙ্কজ সিনহা, ডাঃ বনমালী ভড়, শিশু মন্দির পরিচালন সামিতির সভাপতি জয় প্রকাশ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। রক্তদাতাদের একটি করে চারাগাছ দেওয়া হয়।

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের রাজ্য বার্ষিক সাধারণ সভা

আলিপুরদুয়ার জেলার হাসপাতাল মোড় সংলগ্ন জৈন ভবনে গত ২৯ ও ৩০ জুন—দু'দিন ব্যাপী অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ, পশ্চিমবঙ্গ (স্কুল শিক্ষা) বা এবিআরএসএম (স্কুল এডুকেশন)-এর রাজ্য বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের ২২টি জেলার প্রায় আড়াইশো জন প্রতিনিধি এই সভায় অংশগ্রহণ করেন। এবিআরএসএমের সর্বভারতীয় কার্যকর্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় সংগঠন মন্ত্রী মহেন্দ্র কাপুর, অখিল ভারতীয় সহ-সভাপতি মোহন পুরোহিত এবং পূর্বক্ষেত্রের সংগঠন মন্ত্রী আলোক চট্টোপাধ্যায়। রাজ্য সভাপতি আশিস কুমার মণ্ডল এবং রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি প্রামাণিক-সহ রাজ্যের অন্যান্য বরিষ্ঠ কার্যকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। সভায় রাজ্যের সমস্ত জেলার বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ, বিগত বছরের কার্যসমীক্ষা, আগামী বছরের সাংগঠনিক কর্মসূচি তৈরি, সংগঠনের অর্থনৈতিক স্থিতি, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের পেশাগত বিভিন্ন সমস্যা সমাধান, রাজ্যব্যাপী শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যা সংক্রান্ত আলোচনা, শিক্ষার্থীদের স্বার্থে করণীয় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করা হয়। করণিক, গ্রন্থাগারিক, পেনশনভোগী, পার্শ্ব শিক্ষক, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের বিভিন্ন বিষয় নিয়েও আলোকপাত করা হয়। সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি প্রামাণিক বলেন—বিগত বছরের মতো এবারের সাধারণ সভায় একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতি, দুর্নীতি ও তোষণমুক্ত করার জন্য সংগঠনের সদস্যদের বিশেষ ভূমিকা পালনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। রাজ্য সভাপতি আশিস কুমার মণ্ডল বলেন—'আমাদের এই সংগঠন শিক্ষাক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রবাদের বৈচারিক অধিষ্ঠানের মাধ্যমে ভারতীয়ত্বের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনকারী একটি সংগঠন। আমরা শিক্ষা ও সমাজ হিতের মাধ্যমে দেশের জাতীয় সংকল্পনাকারী। শিক্ষকের পেশাগত অবস্থা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধার বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদানের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় লক্ষ্যে সমাজ হিতকারী যোজনা সমূহ নির্মাণ, বাস্তবায়ন ও শিক্ষার মানোন্নয়নে সর্বদা ক্রিয়াশীল মনোভাব তৈরি হলো এই সভার মূল উদ্দেশ্য। এবিআরএসএমের মূল ভাবধারা হলো—রাষ্ট্র হিতে শিক্ষা, শিক্ষা হিতে শিক্ষক, শিক্ষক হিতে সমাজ'।

সর্বভারতীয় সংগঠন সম্পাদক মহেন্দ্র কাপুরজী বলেন, বর্তমানে দেশের ২৮টি অঙ্গরাজ্যের হাজার হাজার স্কুল এবং শতাধিক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগঠন প্রসারিত এবং গর্বের সঙ্গে বলা যায় ভারতের সর্ববৃহৎ শিক্ষক সংগঠন হলো অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ। বর্তমানে ১২ লক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এই সংগঠনের সদস্য যাঁরা রাষ্ট্রহিতে শিক্ষা, শিক্ষা হিতে শিক্ষক, শিক্ষক হিতে সমাজ এই ভাবধারাকে পাথেয় করে প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছেন।

কোন্নগর কালীতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বস্তিকার পাঠক সম্মেলন

হুগলী জেলার কোন্নগর কালীতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গত ২ জুলাই স্বস্তিকা পত্রিকার পক্ষ থেকে এক পাঠক সম্মেলনের

আয়োজন করা হয়। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বস্তিকার লেখক তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হুগলী জেলা সহ সঙ্ঘচালক আনন্দ মোহন দাস।

বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ডাঃ এস এম গোস্বামী। উপস্থিত ছিলেন স্বস্তিকার শুভানুধ্যায়ী সুমন ঘোষ, দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, বিশ্বজিৎ ভৌমিক, প্রশান্ত পাল, সুকান্ত হালদার, জয়তী মুখোপাধ্যায়, রজত চট্টোপাধ্যায়, অশোক মুখোপাধ্যায়, পুলকবিহারী মজুমদার।

শ্রদ্ধার শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠান

গত ৩০ জুন সকালে সিউড়ি থেকে ৭৫ কিলোমিটার দূরে নলহাটী ২ নং ব্লকের অন্তর্গত ভদ্রপুর পঞ্চায়েতের আকালীপুর গ্রামে

আকালীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রমের শীর্ষ সেবক পূজ্যপাদ স্বামী বাগীশানন্দ পুরী মহারাজকে শ্রদ্ধার ১৫০তম শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। ভারতের একমাত্র গুহ্যকালী মন্দির সংলগ্ন এই সেবাশ্রম এখন ২০টি বিদ্যালয় এবং একাধিক চিকিৎসা কেন্দ্র পরিচালনা করছে। তিনবার ওঁকার ধ্বনি দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন শ্রদ্ধার সংগঠন সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন সভাপতি মহাদেব মুখোপাধ্যায়। পূজ্য সন্ন্যাসীকে পূজা করেন সংগীত শিল্পী অসীমা মুখোপাধ্যায়। মাল্যদান করেন বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। এরপর মানপত্র পাঠ করেন কবি আগমানন্দ মুখোপাধ্যায়। শ্রদ্ধা সংস্থার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। পূজ্যপাদ সন্ন্যাসীর হাতে উত্তরীয়, বস্ত্র, গীতা, ফল ও মিষ্টান্ন তুলে দেন রবীন্দ্রনাথ দাস, কৌশিক চক্রবর্তী, জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রজিৎ দাস, শ্রীকান্ত ঘোষ, বিশ্বনাথ দে। আরতি করেন কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়, সহযোগিতায় সুজাতা বিষ্ণু। মহারাজের আশীর্বাণী শেষে কাঁঠাল চারা লাগিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন শিক্ষক ও সাংবাদিক পতিত পাবন বৈরাগ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র স্মরণে আন্তর্জাল মাধ্যমে আলোচনাচক্র

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে গত ২৯ জুন 'বাংলা আবার'-এর আয়োজনে ইউটিউব সামাজিক মাধ্যমে একটি অনলাইন আলোচনাচক্র আয়োজিত হয়। আলোচনাচক্রে বক্তা রূপে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিজ্ঞানী ও প্রাবন্ধিক অধ্যাপক ড. কল্যাণ চক্রবর্তী এবং বাংলা আবারের প্রধান পৃষ্ঠপোষক যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী কাঞ্চন বন্দ্যোপাধ্যায়। আলোচনাচক্রটি সঞ্চালনা করেন সাধন মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে দুই বক্তা বঙ্গ তথা ভারতীয় জীবনে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান স্মরণ করিয়ে দেন। শ্রোতারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত দুই বক্তারই ভূয়সী প্রশংসা করেন। বাঙ্গালি মনীষীদের স্মরণ করতে প্রবাসী বাঙ্গালিদের উদ্যোগে প্রতি শনিবার এইরকম আলোচনাচক্র আয়োজিত হয়ে আসছে এবং তা ইতিমধ্যেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

ত্রিপুরা ই-রিকশা শ্রমিক সঙ্ঘের ডেপুটেশন

গত ২ জুলাই ত্রিপুরা রাজ্য পশ্চিম জেলা ই-রিকশা শ্রমিক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে আগরতলা ট্রাফিক সদর দপ্তরে পাঁচ দফা দাবি সংবলিত এক ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। মূলত আগরতলা শহরে ট্রাফিক পুলিশদের বিভিন্ন রকম হয়রানি এবং মর্জিমাফিক জরিমানা আদায়ের প্রতিবাদেই এই ডেপুটেশন। ই-রিকশাচালকদের একটি মিছিল আগরতলা প্যারাডাইস চৌমোহিনী হতে শুরু হয়ে ট্রাফিক সদর দপ্তরে যায়। ট্রাফিক সদর দপ্তরের এসপি-র হাতে দাবিপত্র তুলে দেন ত্রিপুরা রাজ্য ই-রিকশা শ্রমিক সঙ্ঘের প্রেসিডেন্ট সবুজ সরকার, সাধারণ সম্পাদক খোকন ঘোষ, সংগঠন মন্ত্রী রাজু বণিক, বিপিটিএসএস-এর সর্বভারতীয় প্রেসিডেন্ট অসীম দত্ত এবং বিএমএস-এর রাজ্য ভাইস প্রেসিডেন্ট অজিত গোস্বামী। উপস্থিত ছিলেন দুই শতাধিক ই-রিকশাচালক।

রাজ্যপালের সঙ্গে বিপিটিএমএমএসের সাক্ষাৎ

ত্রিপুরা রাজ্য প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট মজদুর মহাসঙ্ঘের এক প্রতিনিধি দল গত ১৭ জুন ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধি দলে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ, ত্রিপুরার রাজ্য সভাপতি দেবশ্রী কলই, বিপিটিএমএমএসের মহামন্ত্রী রবিশঙ্কর আল্লুরি, অধ্যক্ষ অসীম দত্ত, প্রদেশ মহামন্ত্রী সুমন শীল, উত্তর-পূর্বের প্রভারী সুদীপ দাস, কেন্দ্রীয় সদস্য রাজু বণিক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সৌজন্য সাক্ষাতের পর প্রতিনিধি দলটি রাজ্যপালের হাতে প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে একটি সনদপত্র তুলে দেন। মাননীয় রাজ্যপাল দাবিগুলির বিষয়ে বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন।

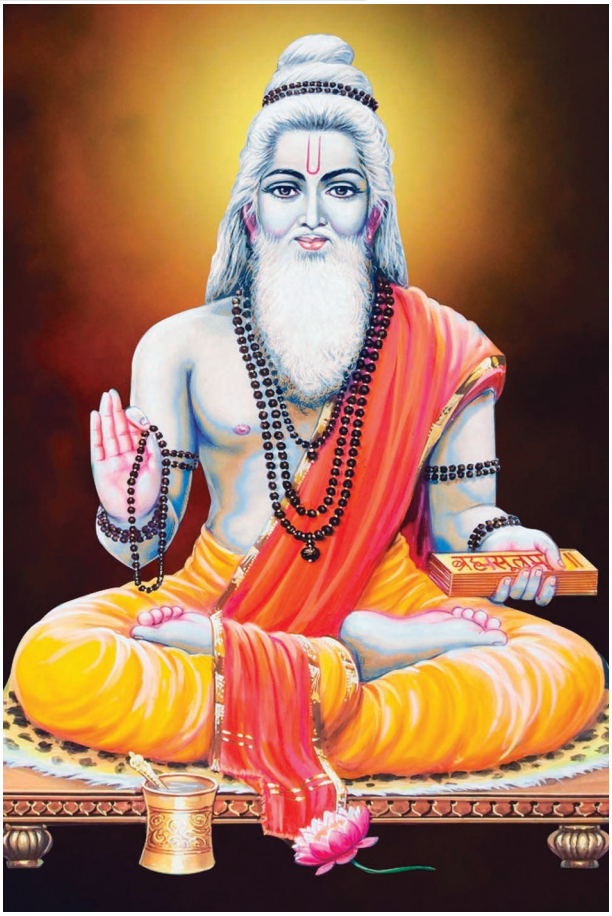

জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস

গোপাল চক্রবর্তী

আষাঢ়ের পূর্ণিমা তিথি গুরুপূর্ণিমা রূপে পালন করা হয়। বিদ্যার্থী থেকে সাধারণ গৃহস্থ এদিন আপন আপন গুরুপূজনের মাধ্যমে গুরুপূর্ণিমা পালন করেন। আষাঢ়ের পূর্ণিমা তিথি মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের জন্মতিথি। কৃষ্ণবর্ণ, দ্বীপে জন্ম, পরবর্তীকালে বেদ বিভাজন করেছিলেন, তাই নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস।

দ্বৈপায়ন পিতার নিকট বেদ অধ্যয়ন করেন। একদা কথা প্রসঙ্গে জানতে পারলেন পিতার নিকট সঞ্চিত বেদমন্ত্র তাঁর অধিগত হয়েছে। তবে আরও অনেক বেদমন্ত্র সংগৃহীত আছে ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে অনেক ঋষির কাছে। দ্বৈপায়ন সংকল্প করলেন সারা ভারতবর্ষ ঘুরে ঋষিদের কাছ থেকে তিনি সমস্ত বেদমন্ত্র সংগ্রহ করবেন। এই দুরূহ কাজে পিতা প্রথমে তাঁকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোনো প্রতিকূলতাই দ্বৈপায়নকে সংকল্পচ্যুত করতে পারল না। অবশেষে ঋষি পরাশর অনুমতি দিলেন। পিতার নির্দেশে দ্বৈপায়ন প্রথমে উপস্থিত হলেন নৈমিষারণ্যে। পিতার আদেশ ছিল শুধু বেদমন্ত্র অধিগত হলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না তার জন্য প্রয়োজন যথোপযুক্ত তপস্যার। নৈমিষারণ্য তপস্যার উপযুক্ত স্থান। নৈমিষারণ্যে কিছুদিন অবস্থান করে দ্বৈপায়ন তপস্যা এবং প্রাচীন ঋষিদের নিকট থেকে নতুন নতুন বেদমন্ত্র অধিগত করলেন। এবার আবার পথ চলা। সমগ্র দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ করে সংগ্রহ করলেন আরও বহু বেদমন্ত্র।

এবার গন্তব্য উত্তরদিকে বিশ্বামিত্রের আশ্রম। সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে উপস্থিত হলেন মহর্ষি গৌতমের আশ্রমে। প্রসিদ্ধ দার্শনিক গৌতম তখন ন্যায়সূত্র রচনা করছেন। দ্বৈপায়ন গৌতমের কাছে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। গৌতমও তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শিষ্যকে সাদরে গ্রহণ করলেন। দ্বৈপায়ন কিছুকাল এই আশ্রমে অবস্থান করে সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায় প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করলেন। পরবর্তীকালে এই শিক্ষা তাঁকে এবং তাঁর রচনাকে সমৃদ্ধ করে। এরপর গৌতমের আশ্রম ছেড়ে দ্বৈপায়ন উত্তর- পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হলেন। এবার বহু তীর্থ ও অনেক আশ্রম পর্যটন করে উপস্থিত হলেন বদরিকা আশ্রমে। মাঝে মায়ের আহ্বানে পৌঁছালেন হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে। এখানেই বীজবপন করে গেলেন তাঁর ভবিষ্যতের অমর কীর্তি মহাভারতের।

আবার পরিক্রমা। সমগ্র জম্বুদ্বীপ পরিভ্রমণ করে দ্বৈপায়ন সমগ্র বেদ মন্ত্র বিভাগ ও বিন্যাস করে চার ভাগে বিভক্ত করলেন। ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব। এই ভাগ মন্ত্রের প্রকৃতি অনুযায়ী ও বৈজ্ঞানিক। বেদ বিভাগ ও বিন্যাসের জন্য এবার তাঁর উপাধি হলো বেদব্যাস। নৈমিষারণ্যের প্রাজ্ঞ ঋষিরা দ্বৈপায়নকে সর্বপ্রথম এই উপাধি প্রদান করেন। নৈমিষারণ্যের ঋষিদের ইচ্ছায় বেদব্যাস নৈমিষারণ্যে প্রতিষ্ঠা করলেন এক বিশ্ববিদ্যালয়। শুধুমাত্র বেদচর্চা নয়, এখানে বেদাঙ্গ হিসেবে শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ ও ছন্দ-সহ উপনিষদ, দর্শন প্রভৃতি পরাবিদ্যার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা চলতে লাগল। সহস্র সহস্র বিদ্যার্থী, শত শত অধ্যাপক, উপাধ্যায়, উপাচার্য। সর্বোপরি আচার্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস। এই অভূতপূর্ব বিশ্ববিদ্যালয় যে জগতের আদি বিশ্ববিদ্যালয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সাধারণ মানুষের মধ্যে সত্য, ধর্ম প্রভৃতি সদ্‌গুণের অবক্ষয় দেখে বেদব্যাস ব্যথিত হলেন। মানুষের মনে সত্য, ধর্ম ফিরিয়ে আনার জন্য মানুষের মধ্যে পুরাণ কথা অর্থাৎ চিন্তাকর্ষক কতকগুলি গল্প যার মধ্য দিয়ে কৌশলে ধর্মকথা অন্তর্নিবিষ্ট করা যায় এবং স্পষ্ট ভাবে উপদেশ না দিয়ে দৃষ্টান্ত দ্বারা সৎ কাজের সুফল এবং অসৎ কাজের কুফল জ্বলন্তরূপে বুঝিয়ে সমাজের হিতসাধনের চেষ্টা করলেন। বলাবাহুল্য অচিরেই এই পুরাণ কথা অকল্পনীয় ভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠে। মহর্ষি সশিষ্য সমগ্র দেশ পরিক্রমা করে পুরাণ কথা প্রচার করলেন। তিনি যেখানে সশিষ্য যেতেন সেখানে জনসমুদ্র, তাই এই জনতার আহার এবং জলের ব্যবস্থা করতে হতো। সারা ভারতবর্ষে এমন কুণ্ড (জলাশয়) এবং ঘাট আজও মহর্ষির সেই স্মৃতি বহন করে চলেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ডে ব্যাসকুণ্ড এবং পশ্চিমে গুজরাটের আরব সাগরের তীরে ব্যাসঘাট।

মহাভারত, অষ্টাদশ পুরাণ, অষ্টাদশ উপপুরাণ ছাড়াও সুদীর্ঘ জীবনে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন মহর্ষি। শুধু ধর্মরক্ষা নয় মানুষের সার্বিক উন্নতির জন্য তিনি ছিলেন সদা সচেষ্ট। ধর্মের নামে যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধেও তিনি ছিলেন সোচ্চার। তিনি জগদ্‌গুরু। আজ গুরুপূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণতি।

শ্রীগুরুপূর্ণিমা উৎসব ও সমর্পণ এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ

রাজদীপ মিশ্র

ভারতীয় সভ্যতায় গুরু শব্দের এক বিশেষ ও গভীর তাৎপর্য রয়েছে। তিনি শুধু শিক্ষক নন, তিনি অধ্যাত্মপথের দিশারি। শিক্ষক ঐহিক জ্ঞানের আর গুরু পারমার্থিক জ্ঞানের পথপ্রদর্শক। মানুষের বিকাশের জন্য গুরু চাই। পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্বে এবং মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্বে উন্নীত করার কাজ করেন গুরু। আমাদের শাস্ত্রে বলা আছে—

'অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনা শলাকয়া
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।'

গুরু আমাদের অসত্য থেকে সত্যের পথে— 'অসতো মা সদ্‌গময়ঃ' অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যান— 'তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ' নিয়ে যায়।

তুলসীদাস বলেছেন— 'গুরু বিনু হোই ন জ্ঞান'। কাজেই আমাদের গুরুর মহত্ত্ব অসীম।

ভারতীয় সংস্কৃতির একটি বৈশিষ্ট্য হলো— যে আমাদের উপকার করেন, আমরা বিনম্র চিত্তে তাঁকে স্মরণ করি, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আষাঢ়ী পূর্ণিমাকে গুরুপূর্ণিমা বলে। ওইদিন হিন্দু সমাজ তার গুরুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে গুরুকে স্মরণ, মনন, চিন্তন করে, পূজন করে এবং যথাসাধ্য গুরুদক্ষিণা সমর্পণ করে। আমাদের ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন, ধর্মজীবন ও রাষ্ট্রজীবনে গুরুপূজার একটি বিশেষ স্থান আছে। ভারতবর্ষের এটাই পরম্পরা।

এই তিথিতে মহর্ষি ব্যাসদেবের জন্ম। ভারতের প্রাচীনতম জ্ঞানভাণ্ডার হলো বেদ। সাধারণ মানুষ যাতে বেদ সহজে বুঝতে পারে, তার জন্য তিনি বেদকে চারভাগে বিভক্ত করেন। ব্যাসদেব মহাভারত রচনা করেন। তাঁর জীবন অগ্নির ন্যায় শুদ্ধ ও পবিত্র। স্বমহিমায় তিনি হিন্দুসমাজের কাছে গুরুরূপে পূজিত হন। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়— 'ব্যাসো নারায়ণং স্বয়ম্।' তাই গুরুপূর্ণিমাকে ব্যাসপূর্ণিমাও বলা হয়।

ব্রজধামে গুরুপূর্ণিমা 'মুড়িয়া পূর্ণিমা' নামে খ্যাত। ওইদিন ব্রজবাসীরা গিরিগোবর্ধনকে সাড়ম্বরে পূজা ও পরিক্রমা করে থাকেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ গত ৯৯ বছর ধরে হিন্দু সংগঠনের কাজ করে চলেছে— ব্যক্তি নির্মাণের কাজ করে চলেছে, এই দেশের পরম্পরা ও সংস্কারকে গতি তথা পুষ্ট করার চেষ্টা করে চলেছে।

১৯২৫ সালে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পর সঙ্ঘের গুরু কে হবেন, সে বিষয়ে ডাক্তারজী গভীর চিন্তন করেন। তিনি ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, তিনি ভাবলেন, আমি সম্পূর্ণ হিন্দুসমাজকে সংগঠিত করতে চাইছি, কোনো ব্যক্তিকে গুরু হিসেবে মান্যতা দিলে সবাইকে কী তিনি প্রেরণা দিতে পারবেন? মানুষ তো শাশ্বত নয়, মানুষ মরণশীল। যে কোনোদিন মানুষের পতন বা পদস্খলন হতে পারে। আবার এটাও দেখা গেছে, ব্যক্তিভিত্তিক সংগঠন দীর্ঘদিন নাও টিকে থাকতে পারে। ব্যক্তির জন্য ব্যক্তি গুরু হতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের জন্য নয়। তাই সঙ্ঘ কোনো ব্যক্তিকে গুরু হিসেবে গ্রহণ করেনি।

১৯২৮ সালে যখন প্রথম সঙ্ঘে গুরুপূর্ণিমা উদ্‌যাপন হয়, তখন ডাক্তারজী বলেছিলেন, সঙ্ঘ আদর্শ, চিহ্ন বা প্রতীককেই গুরুরূপে বরণ করবে। আমরা সঙ্ঘকাজের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে সমাজ পুনর্নির্মাণের সংকল্প করেছি। কাজেই প্রেরণা দিতে পারেন— এমন গুরুই আমাদের প্রয়োজন। হাজার বছর ধরে যিনি আমাদের প্রেরণা দিয়েছেন সেই পরমপবিত্র গৈরিক ধ্বজকেই সঙ্ঘ গুরুর স্থানে রেখেছে। সঙ্ঘ ব্যক্তিপূজক নয়, তত্ত্ব পূজক। এই তত্ত্বের প্রতীক হলো পরমপবিত্র গৈরিক ধ্বজ। যুগযুগান্তরব্যাপী কালপ্রবাহে সমাজ দ্বারা স্বীকৃত শাশ্বত ও সনাতন হিন্দুত্বের সর্বোচ্চ আদর্শের প্রতীকরূপী পরমপবিত্র গৈরিক পতাকাকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ গুরুর স্থানে প্রতিষ্ঠা করেছে। গৈরিক ধ্বজ সঙ্ঘের সৃষ্টি নয়। তার উৎপত্তি কবে, কেউ বলতে পারে না। হিন্দু সমাজে এই ধ্বজ পরম্পরাগতভাবে চলে আসছে। যে

ধ্বজ হাজার বছর ধরে আমাদের রাষ্ট্রধর্মের প্রতীক ছিল, সঙ্ঘ তাকে শুধু গ্রহণ করেছে। গৈরিক ধ্বজ ধর্মের প্রতীক, প্রগতির প্রতীক, গৌরব-জ্ঞান-ত্যাগ ও সাহসের প্রতীক। ইতিহাসে দেখা যায়, ভারতবর্ষে ভোগের পূজা করেনি, ত্যাগের পূজা করেছে। রাজার পূজা করেনি, সন্ন্যাসীর পূজা করেছে। সন্ন্যাসী এলে রাজা তাঁর রাজসিংহাসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। ত্যাগের আদর্শের পূজারি। এই ত্যাগের প্রতীক হলো গৈরিক ধ্বজ।

গুরুপূজা ও গুরুদক্ষিণা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। গৈরিক পতাকার সামনে দাঁড়ালে আমাদের রাষ্ট্রজীবনের প্রাচীন গৌরবগাথা, পরাক্রম ও বিজয়ের ঘটনা চোখের সামনে যেন দৃশ্যমান হয়; দেশ পরম বৈভবশালী হওয়ার আবশ্যিক গুণাবলী অন্তরে জাগ্রত হয়। এই পতাকা আমাদের রাষ্ট্রপুরুষ অর্থাৎ সাক্ষাৎ পরমাত্মারূপে আমাদের সামনে বিরাজমান। যজ্ঞশিখার প্রতীক, আত্মসমর্পণের দ্যোতক এই পবিত্র পতাকা আমাদের আদর্শ। গৈরিক পতাকার সামনে আমরা সর্বস্ব সমর্পণের জন্য বদ্ধপরিকর।

সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তারজীর চিন্তন ছিল— আমাদের সংগঠনের ব্যয়ভার আমরা অর্থাৎ স্বয়ংসেবকরা বহন করব। তাই ৯৯ বছর পরেও বিশ্বের সর্ববৃহৎ অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবী সেবামূলক সংগঠনটির ব্যয়ভারের জন্য কোনোদিন ব্যবসায়ীর কাছে, সরকারি অনুদানের কাছে হাত পাততে হয়নি; বিলবই ছাপিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়নি। এখন 'আত্মনির্ভর কথাটি খুব চলছে। ১৯২৮ সালে ডাক্তারজী এই বিষয়ে চিন্তন করে একে বাস্তবে রূপ দেন।

সঙ্ঘ চায় স্বয়ংসেবকদের মধ্যে সমর্পণভাব জাগ্রত হোক। 'তেরা বৈভব অমর রহে মা/হাম দিন চার রহে না রহে'— এই ভাব নিয়ে স্বয়ংসেবকরা গুরুদক্ষিণা করে। গত বছরের থেকে বেশি গুরুদক্ষিণা করবো— এই চিন্তা স্বয়ংসেবকদের মনের মধ্যে থাকে। যে গুরুকে আমরা অর্চনা করি তাঁর গুণসমুহ অর্জন করতে হবে, তা না হলে কর্তব্য পূর্ণ হবে না। বলা হয়— 'শিবোভূত্বা

শিবম্ যজেৎ'— শিব হয়ে শিবের পূজা করতে হবে। গুরুদক্ষিণাও তাই। সঙ্ঘ বলে, ত্যাগী হয়ে ত্যাগ কর। কী ত্যাগ করতে হবে? আমরা তো দক্ষিণা সমর্পণ করি। কিন্তু এটা তো সাংকেতিক। এর সঙ্গে সমাজ জাগরণের জন্য আজকের আবশ্যকতা হলো সময়দান। সমাজকে ধ্বংস করার জন্য যে অপশক্তি কাজ করছে, তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করে আমাদের যদি এগিয়ে যেতে হয়, তবে আমাদের শক্তি বাড়াতে হবে। আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি-সময়-অর্থ সমাজের জন্য সমর্পণ করতে হবে। 'জীবনে যাবদাদানম্ স্যাৎ প্রদানম্ ততোধিকম্'— সমাজ থেকে যা নিয়েছি, তার থেকে যেন বেশি দিতে হবে।

কেউ বলে দিয়েছে বলে গুরুদক্ষিণা করলাম— এটা সমর্পণ নয়। আমি আমার সামর্থ্যের অধিক দিয়েছি— মনে এই সন্তোষ আবশ্যক। আমার অনেক আছে, তার থেকে কিছু দিলাম— এটাও সমর্পণ নয়। সমর্পণ হলো অর্থ ও শ্রদ্ধার যোগফল। ত্যাগ স্বীকার করে, কষ্ট করে, শ্রদ্ধার সঙ্গে যা দেওয়া হয় তাই সত্যিকারের সমর্পণ। 'কত দিচ্ছি'— এটা বড়ো কথা নয়; বড়ো কথা হলো কী মনোভাব নিয়ে দিচ্ছি। গুরুদক্ষিণা চাঁদা নয়, দান বা সাহায্য নয়। এর কোনো বাঁধাধরা পরিমাণও নেই। এটি শ্রদ্ধা, স্ব-ইচ্ছা এবং সক্ষমতার ওপর নির্ভর করে। বলা হয়— 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীতাঃ'— ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর। আবার বলা হয়— 'ন ধনেন প্রজয়া ত্যাগেনৈকে নামৃতত্ব মানশুঃ' ধন বা প্রজন্ম উৎপাদনের দ্বারা নয়, কেবলমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করা সম্ভব।

প্রাচীনকালে দেখা যায়, শিষ্যের পরীক্ষা নেবার জন্যই গুরুরা দক্ষিণা চাইতেন। পাণ্ডবদের কাছে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ দ্রোণাচার্য রাজা দ্রুপদকে বন্দি করে আনার কথা বলেছিলেন। গুরুদক্ষিণাস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গুরু সন্দীপনী মুনির পুত্রকে শঙ্খাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করে উদ্ধার করে আনেন। সমুদ্রের তলদেশে যুদ্ধ করার সময় তিনি পাঞ্চজন্য শঙ্খ প্রাপ্ত হন। শিক্ষা সমাপ্ত হলে গুরু বিদ্যারণ্য শিষ্য দয়ানন্দকে বলেন, সম্পূর্ণ সমাজের জন্য, ধর্মের জন্য তোমাকে সমর্পণ করতে হবে। এছাড়াও একলব্য, জীবক, আরুণি প্রমুখ শিষ্যের গুরুদক্ষিণার কথাও আমরা জানি।

গুরুদক্ষিণা শুধু অর্থকরী বিষয় নয়। কোনো স্বয়ংসেবক গুরুদক্ষিণা দ্বিগুণ করলে তার এলাকায় শাখা দ্বিগুণ হবে না। কোনো জেলায় গুরুদক্ষিণা কমে গেলে সেখানে শাখা কমে যাবে না। গুরুদক্ষিণার সমাপ্তির দিন পেরিয়ে যাওয়ার পর গুরুদক্ষিণা করতে এলে আমরা সম্মতি দিই না। শুধু পয়সার বিষয় হলে বছরের যে কোনো সময় গুরুদক্ষিণা করা যেত। বছরের মাঝে অর্থের প্রয়োজন পড়লে আমরা আবার গুরুদক্ষিণা করতে বলি না। কাজেই অর্থের জন্য সঙ্ঘকাজের গতি বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় না। সঙ্ঘকাজের গতি বৃদ্ধি হয় স্বয়ংসেবকদের সমর্পণ ভাবের জন্য। এই আত্মনির্ভর পদ্ধতির জন্য এই সংগঠনকে আজ পর্যন্ত কারও কাছে হাত পাততে হয়নি। অর্থ নিয়ে এই সংগঠনের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগও ওঠেনি।

শুধু অর্থ সমর্পণ নয়, ধীরে ধীরে মন সমর্পণ, বুদ্ধি সমর্পণ, সময় সমর্পণ এবং রাষ্ট্রদেবতার চরণে নিজের সম্পূর্ণ জীবন সমর্পণ করতে হয়। এই ভাবনা দু'এক দিনে নির্মাণ হয় না। নিত্যসংস্কারের মাধ্যমে এই ভাব নির্মাণ হয়। নিত্যশাখার মাধ্যমে সমর্পিত কার্যকর্তা নির্মাণের পদ্ধতি সঙ্ঘের আছে। সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা ডাক্তারজী স্বাবলম্বী সংগঠন এবং সমাজের দেশের জন্য সমর্পণ— এই মানসিকতা নির্মাণের জন্য গুরুদক্ষিণার প্রচলন করেছিলেন। □

ভারতীয় অধ্যাত্মজীবনে গুরুপূর্ণিমা ও মহানামব্রতজী

বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী
মহাউদ্ধারণ মঠ, কল-৫৪

সনাতন ধর্মের দেশ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ভারতবর্ষ। অনাদিকাল থেকেই ভারতবর্ষের কিছু অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে যা পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে একে অসাধারণ করে রেখেছে। ভারতের দু'টি বৈশিষ্ট্য, একটি তার সংস্কৃতি ও অপরটি সংস্কৃত ভাষা। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন বা সভ্যতার আলোকবঞ্চিত, তখন থেকেই ভারতের প্রাচীন ঋষিযুগে বেদবেদান্তের চর্চায় তাঁরা থাকলেন ভূমা বা বৃহতের চিন্তায় ব্রহ্মের অনুসন্ধানে কৃচ্ছ্রতার সঙ্গে সাধনরত। সনাতন ধর্মশাস্ত্রের মূল হলো বেদ। বেদ অর্থ জ্ঞান। এই বেদের অন্ত বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলো বেদান্ত বা উপনিষদ। উপনিষদের সার তত্ত্বকে নিয়ে রচিত হলো ব্রহ্মসূত্র, যা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের সৃষ্টি। তাঁর হাতেই রূপ পেয়েছে মহাভারত ও ভাগবত আদি অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও উপপুরাণাদি। এই মহামতি বেদব্যাসের জন্মতিথি হলো আষাঢ়ী পূর্ণিমা যা গুরুপূর্ণিমা নামে খ্যাত। এই পুণ্য তিথিতেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পিতৃস্বরূপ শ্রী'ল সনাতন গোস্বামীর প্রয়াণতিথি। গৌড়ীয় ত্যাগী বৈষ্ণবেরা তাই এই দিনে

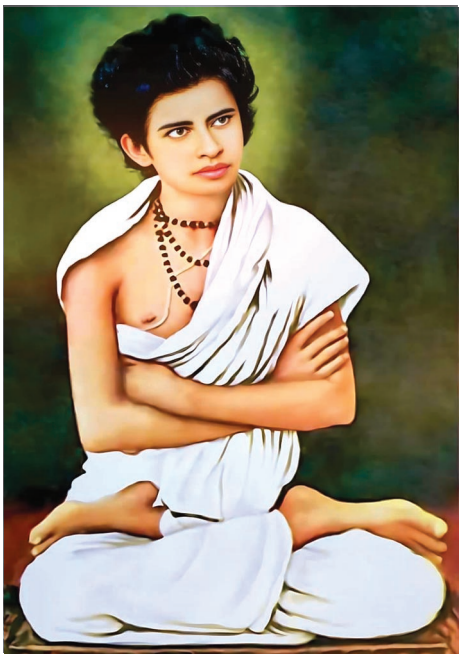

মস্তক মুণ্ডন করে থাকেন।

ভগবান জগৎ-সৃষ্টিকর্তা। জগতের প্রতিটি সৃষ্ট বস্তু তথা জীবের সঙ্গে তাই তাঁর ওতপ্রোত সম্বন্ধ, অর্থাৎ সব কিছুর মধ্যেই তিনি আছেন। প্রতিটি জীবের মধ্যে এবং প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে তিনি অন্তর্যামী রূপে আছেন। ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর সঙ্গে ক্রীড়া করবেন বলে। তিনি মানুষ জাতিকে তাঁর আকৃতির মতো করেই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন, মানুষ সাধন ভজন করতে করতে আমার স্বধর্ম লাভ করতে সক্ষম হয় (মম সাধর্ম্যম্ আগতাঃ)। তিনি মানুষকে ভগবন্মুখী করার জন্য এত কৃপা ঢেলে তাদের সৃষ্টি করেছেন যে, মানুষ সাধনায় ক্রমে ঈশ্বরতুল্য হয়ে যেতে পারে। তিনি মানুষের সঙ্গে একাত্ম হতে চান বলে তাঁর প্রচেষ্টার শেষ নেই। তাই তিনি সাধুরূপে, শাস্ত্ররূপে, গুরুরূপে ও অন্তর্যামীরূপে নিয়ত সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব মানুষকে আদর্শ মানুষ তথা দেব-মানুষে পরিণত করার চেষ্টায় রত। তাই গুরুপূর্ণিমার দিনে আমাদের দীক্ষাগুরু বা শিক্ষাগুরু তথা গুরুজনদের সেবার্চনা করার দিন, গুরুমন্ত্রে বলা হয়েছে—

'অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

অর্থাৎ যিনি বিশ্বচরাচরকারী

অখণ্ডমণ্ডলাকার ঈশ্বরকে চিনিয়ে দেন তিনিই আমাদের গুরু। আমার শ্রীগুরুদেব 'ভাগবত-গঙ্গোত্তরী' শ্রীমৎ ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহারাজ ও তাঁর শ্রীগুরুদেব শ্রীপাদ মহেন্দ্রজীর কথা সংক্ষেপে বলব।

আমার শ্রীগুরুদেবের বাড়ি ছিল অখণ্ড ভারতের অখণ্ড বঙ্গের বরিশাল জেলার চাখারের নিকটবর্তী খলিসাকোটা গ্রামে। তিনি ছোটোবেলা থেকেই ছিলেন ধর্মপ্রাণ ও মেধাবী। বয়স যখন তাঁর চৌদ্দ বছর, তিনি শুনলেন নবগৌরাঙ্গ শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধুসুন্দর ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে লীলায় অবস্থান করছেন। তিনি দীর্ঘ প্রায় ষোলো বছর আট মাস মহাগম্ভীরা বাসের পর সম্প্রতি প্রকাশিত হয়ে সকলকে দর্শন দিচ্ছেন। একথা শুনে তিনি এক বন্ধুকে সঙ্গে করে দীর্ঘ ৮০ মাইল পথ খালি পায়ে হেঁটে পাড়ি দিয়ে ফরিদপুর পৌঁছলেন। শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী বালক মহানাম (তখন নাম বঙ্কিম)-কে প্রভুর কক্ষে নিয়ে মিলন করিয়ে দিলেন (তাঁর ভাষায় 'বিয়ে' দিয়ে দিলেন)। প্রভুর ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্নিত চরণযুগল তুলসী চন্দনে পূজা করে আত্মসমর্পণ করল বঙ্কিম।

শ্রীপাদ মহেন্দ্রজীর কথায় অতঃপর বঙ্কিম বাড়ি ফিরে গিয়ে এন্ট্রান্স (মাধ্যমিক) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মায়ের কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়ে প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের আঙ্গিনায় সাধু-জীবন যাপনের জন্য একেবারে চলে আসেন। মহেন্দ্রজী তাঁকে দীক্ষা দিয়ে নাম দেন মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। এরপর ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে তাঁকে পাঠালেন সাধুর বেশ দিয়ে। তারপর সসম্মানে স্নাতক পরীক্ষায় বৃত্তিসহ উত্তীর্ণ হয়ে মহানামকে পাঠালেন কলকাতায়।

সেখানে মানিকতলা মহাউদ্ধারণ মঠে থেকে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতে ন্যায়দর্শন নিয়ে এম.এ. স্বর্ণপদক-সহ সসম্মানে পাশ করেন। অতঃপর দর্শন বিভাগেও এম.এ. পাশ করেন মহানামজী। এরই মধ্যে ১৯৩৩-এ শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বধর্ম সম্মেলন আমেরিকার শিকাগোতে। সেখানে মহানাম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি পাঠানোর অনুরোধ করে আমন্ত্রণ পত্র আসে। শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী তাঁর প্রিয় মহানামব্রতকে পাঠাতে মনস্থ করলেন। বক্তৃতায় অনভিজ্ঞ লাজুক মহানামজী গুরু-আজ্ঞা নিয়ে প্রায় রিক্ত অবস্থায় রওনা হলেন শিকাগোর উদ্দেশে। বহু কষ্টে গিয়ে পৌঁছালেন আমেরিকায়— সে যাত্রা কাহিনি বড়োই নাটকীয় ও রোমহর্ষক। সেই বিশ্বধর্ম সম্মেলনে মহানামব্রতজী যে ৪টি ভাষণ দেন তাতে বিশ্বধর্মনেতারা ও বিশ্বধর্ম সম্মেলনের কর্তাব্যক্তিরা মুগ্ধ হন। তিনি সনাতন ধর্মের আধুনিক নাম দেন 'ভদ্রলোকের ধর্ম' (Religion of Gentleman)। অহিংসা, সত্য, আচার্য, শৌচ ও সংযম— এই পাঁচটি মানব জাতির চিরকালের সাধারণ লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য, আর এটাই মানব ধর্ম, এটাই আর্যধর্ম, এটারই আধুনিক নাম হিন্দুধর্ম। বিশ্বে ধর্মে ধর্মে যে এত হানাহানি— এর মূল কারণ হচ্ছে— পৃথিবীতে যা ধর্ম বলে চলে তা আসলে মত বা ইজম যেমন খ্রিস্টান মত, ইসলাম মত, বৌদ্ধ মত, পার্সি মত, ইহুদি মত ইত্যাদি।

মানুষের ধর্ম একটাই, তা হলো মানবধর্ম। এক মত আর এক মতকে ভাঙিয়ে তার জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটায়। এই কারণে মতে মতে সংঘর্ষ। কিন্তু হিন্দুধর্ম মানবধর্ম— তাই সে কোনো মতকে ভাঙিয়ে নিজের দল বড়ো করতে চায় না, সে চায় সকলেই মানবধর্মে স্থিত হয়ে নিজ নিজ মতের আদর্শে একনিষ্ঠ থাকুক। এই মানবধর্মই পারে বিশ্বে বিরোধ মেটাতে। মহানামজীর এই যুক্তিপূর্ণ কথা বিশ্বনেতারা মান্যতা দিলেন এবং স্বীকার করলেন এই 'ভদ্রলোকের ধর্ম'ই যা মহানামজীর ভাষায় হিন্দুধর্ম সেটাই বিশ্বে আজ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। তাঁরা মহানামজীকে আমেরিকায় প্রায় পাঁচ বছর আট মাস রেখে দিলেন এবং মহানামজী ভারতের ধর্ম-সংস্কৃতির বিপুল প্রচার করে তাঁদের ভারত সম্পর্কে ভুল ধারণার নিরসন করলেন। জয় হলো সনাতন ধর্মের। জয়তু মহানামব্রত। জয় গুরুপূর্ণিমা তিথি। □

With Best Compliments from -

A

Well wisher

শ্রীগুরু-শিষ্য সংবাদ

বালানন্দ ব্রহ্মচারী ও তারানন্দ ব্রহ্মচারী

সুমঙ্গল চট্টোপাধ্যায়

১৯২১ সাল। শীতকাল। দেওঘর তপোবন আশ্রমের একটি ক্ষুদ্র গৃহের ছাদে দাঁড়িয়ে মহাযোগী বালানন্দ ব্রহ্মচারী দেখলেন এক অচেনা অদেখা তরুণ সিঁড়ি ভেঙে তাঁরই দিকে এগিয়ে আসছেন।

তারানন্দ ব্রহ্মচারী

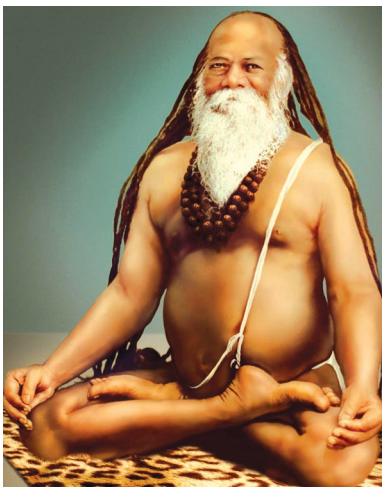

বালানন্দ ব্রহ্মচারী

তরুণটির নাম তারকদাস চক্রবর্তী।

জটাজুটধারী শ্মশ্রুগুম্ফশোভিত দিব্যকান্তি যোগীকে প্রণাম করতেই তিনি সস্নেহে বললেন— 'আয়া!'

তারকদাস বললেন— 'হ্যাঁ মহারাজ, আয়া।'

—'মাতাজীকে রায় লেকর আয়ে হো?'

—'নেহী মহারাজ।'

—'তব নেহী হোগা। মাতাজীকো পুছকে আনা।'

পরবর্তীকালে এই প্রথম সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে তারানন্দ মহারাজ লেখেন— 'যোগাবতার মহাত্মা বালানন্দ মহারাজের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারেই তাঁহার নয়নদ্বয় প্রকাশ করিয়াছিল তিনি যোগী। রক্তিমাভ জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত চক্ষুদ্বারা তিনি সত্যই আকৃষ্ট সাধকের মনের অন্ধকার বিদূরিত করিতেছেন আর সদ্যোস্নাত জটাজাল নিঃসৃত বিন্দু বিন্দু জল দ্বারা তদীয় হৃদয়ে ভক্তিবারি সিঞ্চন করিয়া ভক্তির বীজ রোপণ করিতেছেন।

শ্রীরামপুরে নিজের বাড়িতে ফিরে গেলেন তারকদাস। মাকে সব কথা খুলে বললেন। কিন্তু মা শৈলনন্দিনী দেবী অরাজি। শেষে মায়ের মত না নিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে আবার দেখা করলেন বালানন্দ মহারাজের সঙ্গে।

—'মহারাজ, আমি এসেছি।'

—'মাতাজী কো রায় লেকর আয়া?'

—'নেহী মহারাজ। মাতাজী মত নেহী দিয়া।'

—'তব?'

তারকদাস বললেন— 'মায়েরা কি সহজে মত দিতে চায় মহারাজ?'

বালানন্দ ব্রহ্মচারী নীরব। হয়তো তাঁর মনে পড়ছিল তাঁর মা নর্মদা দেবীর কথা। তিনিও তো মাকে না জানিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন, দীক্ষা নিয়েছিলেন নর্মদার বরপুত্র মহাযোগী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের কাছে। রাজি হলেন বালানন্দ ব্রহ্মচারী। কৃপাসিন্ধুর সানন্দ অনুমোদন লাভ করলেন তারকদাস। শুরু হলো তাঁর জীবনের এক নতুন অধ্যায়।

বালানন্দ-আশ্রম এখন অনেক বড়ো হয়েছে আর মহারাজও বৃদ্ধ হয়েছেন। তখন তাঁর বয়স প্রায় নব্বই। এত বড়ো আশ্রমের নানা কাজের ভার সুষ্ঠুভাবে বহন করা পূর্ণানন্দ এবং অন্যান্য সাধুদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। এমনই সংকটকালে 'যোগক্ষেম বহনকারী' ভগবান আশ্রমের এই সংকট দূর করবার জন্যে বালানন্দ মহারাজের চরণপ্রান্তে পাঁচ তরুণ বাঙ্গালি তরুণকে এনে দিলেন। এঁদের মধ্যে প্রথম আসেন তারকদাস।

নবাগত তারকদাসকে 'যোগ্য' হবার পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। বালানন্দজী তাঁকে শ্বাপদসংকুল তপোবন পাহাড়ে রেখে আসেন। আট দিন বাদে তিনি চলে আসেন রামনিবাস আশ্রমে গুরুদেবের কাছে। বালানন্দ মহারাজ খুশি হলেন এবং তাঁকে তাঁর শারীরিক সেবার ভার দিলেন। অল্পদিনে এই 'পদোন্নতি'। বিস্ময়কর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। এক সন্ধ্যায় আশ্রম-সংলগ্ন শিব মন্দিরের পশ্চিমের বাগানে বালানন্দ প্রাকৃতিক কারণে গেছেন। তাঁর ঈশ্বরোপম গুরুদেবের যদি কোনো সেবার প্রয়োজনে লাগেন এই চিন্তায় মগ্ন হয়ে অদূরে দণ্ডায়মান আছেন তরুণ সেবক। হঠাৎ ঘটে যায় এক অলৌকিক ঘটনা। তারকদাসের সেবায় তৃপ্ত বালানন্দ মহারাজ তরুণ তারকদাসের সামনে মেলে ধরলেন তাঁর আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের ডালি। তারকদাস দেখলেন বালানন্দের সর্বাঙ্গ হয়ে উঠেছে জ্যোতির্ময় আর ওই শুভ্রবরণ জ্যোতির্ময় দেহটি তাঁর দিকেই আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। তারকদাস হতবাক! তারকদাসের দিব্যচক্ষুর উন্মীলন ঘটেছে কিনা তা পরীক্ষা করবার জন্যে জিজ্ঞেস করলেন, 'ক্যায়া দেখা? ক্যায়া দেখা?'

বালানন্দজীর বিশ্বস্ত সেবক হিসেবে তারকদাসের দিন কাটতে লাগল। সেবকের সেবা ও নিষ্ঠায় তৃপ্ত বালানন্দ মহারাজ একদিন জিজ্ঞেস করলেন। 'কি

গো, দীক্ষা নেবার ইচ্ছে আছে নাকি?' অনুগত সেবক বললেন— 'আপনি যদি আমাকে উপযুক্ত মনে করেন তাহলে দীক্ষা দেবেন।'

বাংলা ১৩২৮ সালে তারকদাসকে বালানন্দ মহারাজ ত্রিপুরাসুন্দরী মন্ত্রে দীক্ষা এবং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য দান করলেন। তারকদাসের নাম হলো তারানন্দ ব্রহ্মচারী। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি পালন করতেন ব্রহ্মচর্য, সত্যনিষ্ঠা, তপস্যা, দান, শৌচাদি নিয়ম, ক্ষমা, অহিংসা, সহিষ্ণুতা, অস্তেয় প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত কর্ম। আশ্রমে বালানন্দজীর পার্শ্বচর 'ছোটো বাবা'র সহায়তায় তিনি 'নৌলি', 'উড্ডীয়মান', 'মূলবন্ধ' প্রভৃতি যৌগিক মুদ্রা ও 'স্বরশাস্ত্রে' পারদর্শী হয়ে ওঠেন এবং গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করেন যাবতীয় হিন্দু শাস্ত্র, দর্শন ও ধর্মগ্রন্থ। সুদর্শন ছিলেন তিনি, কিন্তু যোগ সাধনার ফলে তাঁর চেহারার আমূল পরিবর্তন হয়েছিল। বৈদিক ঋষির মতো তাঁর জ্যোতির্ময় মূর্তি দেখে সবাই বিস্মিত হতো।

প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়েছেন তারানন্দের মা শৈলনন্দিনী দেবী। একদিন খবর পেলেন তাঁর পৃষ্ঠব্রণ হয়েছে, কষ্ট পাচ্ছেন। বালানন্দ মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে শ্রীরামপুরে মায়ের কাছে ফিরে গিয়ে মাতৃসেবা করতে বললেন। তারানন্দ মহারাজ শ্রীরামপুরে ফিরে গেলেন। এই সময় রিষড়ায় গঙ্গার ধারে এক ডাক্তারের দেওয়া ছোটো জমিতে তিনি স্থাপন করলেন 'প্রেম মন্দির' এবং মাকে নিয়ে এসে দেবী জ্ঞানে পূজা করতে লাগলেন। ছোট্ট আশ্রমে ধর্মপরায়ণা মা আর তাঁর যোগী পুত্র স্থাপন করলেন শ্রদ্ধা-সেবা-প্রেম-স্নেহের এক অনুপম আদর্শ। মাতৃ বিয়োগের পর তিনি মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন এবং স্থাপন করলেন মায়ের মর্মর মূর্তি। নিত্য পূজার ব্যবস্থাও করলেন। আজও সেই ব্যবস্থার হেরফের হয়নি।

দিন যায়। আশ্রমে ভক্তরা আসা-যাওয়া করতে থাকেন। একদিন খবর এলো তাঁর গুরুদেব, সমকালীন ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সিদ্ধযোগী ১০৭ বছর বয়সে ব্রহ্মলীন হয়েছেন। তারানন্দজী শ্রীগুরুর ঔর্ধ্বদেহিক কাজে যোগদানের জন্য রওনা হলেন করণীবাদ আশ্রমে। 'আও মেরা বাচ্চা' বলে সস্নেহে যিনি তাঁকে অভিনন্দন করতেন, সেই 'নিত্য মঙ্গলে, জ্যোতিঃ নির্মল, শান্ত, সুমধুর উজ্জ্বল যোগাবতার শ্রীগুরুদেব আর নেই।

গুরুদেব ব্রহ্মলীন হয়েছেন কিন্তু তাঁর বাণী, আদর্শ ও শিক্ষা তারানন্দ মহারাজের হৃদয়ে চিরদিন অম্লান ছিল। কোনো ভক্ত যদি তাঁকে 'ত্যাগী' বলতেন, তখন তিনি গুরুদেবের মুখে শোনা সেই অপূর্ব বাণীটি শোনাতেন— 'আমি কী ত্যাগ করেছি? হ্যাঁ, সংসার ত্যাগ করেছি। কিন্তু তোমরা আমার চেয়ে অনেক বেশি ত্যাগী! তোমরা স্বয়ং ঈশ্বরকে ত্যাগ করে বসে আছো।'

ভক্তদের নিজের গুরুদেব সম্বন্ধে তারানন্দ মহারাজ বলতেন— 'ষট্‌চক্রের বর্ণনা বা সাধনার কথা বহু গ্রন্থে আমরা দেখিয়া থাকি, কিন্তু প্রতিটি চক্রকে সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করিয়া ধীরে ধীরে পূর্ণতাপ্রাপ্তি করিয়াছেন— এইরূপ সাধক খুবই বিরল। কিন্তু গুরু মহারাজ নয় বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া কঠোর সাধনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। তাই তাঁহার পক্ষে ওই কঠিন ও সময় সাপেক্ষ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব হইয়াছিল। তিনি ষট্‌চক্রের প্রত্যেকটি চক্রভেদ করিয়াছিলেন। যোগমার্গের ব্যায়াম স্বরূপ যে প্রধান চতুরশীতি আসন নিরূপিত আছে, তাহা তিনি অক্লেশে করিতেন।' তারানন্দ মহারাজের ভাষায় তাঁর গুরুদেব ছিলেন— 'সিদ্ধ যোগী, 'তত্ত্বসিদ্ধি', 'দিব্যশ্রোতের অধিকারী', 'বাকসিদ্ধ মহাপুরুষ', 'ব্যোমতত্ত্বে সমাহিত', অলৌকিক জ্ঞান ও শক্তির অধিকারী', দিব্যকান্তি সৌম্যমূর্তি সদাহাস্যমুখ অপূর্ব তেজঃপুঞ্জ কলেবর' এবং 'বাঞ্ছাতিরিক্ত ফললাভের অধিকারী' এক 'মহাতাপস'। এ ছাড়া সবার প্রতি তাঁর গভীর প্রেম ও স্নেহ, গল্পচ্ছলে ধর্মোপদেশ দেবার ক্ষমতা, গাছপালা পশুপাখির প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসা— এসবই অবিস্মরণীয়।

রিষড়ার প্রেম মন্দিরে গুরুদেবের প্রতিকৃতিতে প্রতিদিন তারানন্দজী ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করতেন, গুরুদেবের উদ্দেশে নিবেদন করতেন স্বরচিত শ্লোকে শ্রদ্ধাঞ্জলি—

'ন জানামি ভাবং ন বা ব্রহ্মভাবম্
ন জানামি যোগং ন বা পূজনন্তে।
প্রভো পাহি মাং কিংকরং চাশ্যরণ্যম্
নমস্তে গুরো সর্ববিদ্যা প্রদায়।।'

শুধু পূজা বা প্রার্থনা নয়, শ্রীগুরুর উপদেশকে নিজের জীবন রূপ দান করাই হলো তাঁর প্রধান কর্তব্য। 'হম্ সৃষ্টি মেঁ শ্রেষ্ঠ জীবন— দুর্লভ মনুষ্য জীবন পায়া হ্যায়। ইস্ জীবন পাকে হামারা কেয়া করনা চাহিয়ে। হামকো ঈশ্বরকো প্রাপ্ত হোনা চাহিয়ে, মোক্ষ প্রাপ্ত হোনা চাহিয়ে। আউর হম্ কৌন হ্যায়?' শান্ত পাঠ, যোগ, জনকল্যাণ ও অধ্যাত্ম সাধনার মধ্যে দিয়ে তারানন্দ মহারাজ তাঁর গুরুদেবের এই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন।

১৯৮১ সালে আশি বছর বয়সে স্বেচ্ছামৃত্যুকে বরণ করে জীবন্মুক্ত পরানন্দ ব্রহ্মচারী বীদেহমুক্ত হন।

'বহুলরজসে বিশ্বোৎপত্তৌ ভবায় নমো নমঃ
প্রবলতমসে তৎসংহারে হরায় নমো নমঃ।
জনসুখকৃতে সত্ত্বোদ্রিক্তৌ মৃড়ায় নমো নমঃ।
প্রমহসি পদে নিস্ত্রৈগুণ্যে শিবায় নমো নমঃ।।
(শিবমহিম্ন স্তোত্র)

গ্রন্থ ঋণ :
হে অনন্ত পুণ্য— সুমঙ্গল চট্টোপাধ্যায়
হে মহাজীবন— সুমঙ্গল চট্টোপাধ্যায়

(লেখক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক)

With Best Compliments from -

A

Well wisher

প্যারিস অলিম্পিক গেমসের খবর

নিলয় সামন্ত

প্যারিস অলিম্পিক গেমসের আর্চারিতে সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করার যে টুর্নামেন্ট ছিল তাতে দলগতভাবে ব্যর্থ হয়েছিল ভারতীয় পুরুষ ও মহিলা উভয় দল। তবে আশার আলো ছিল এর আগের টুর্নামেন্টগুলোতে, সেখানে তাদের পারফরম্যান্স ভালো ছিল। ফলে তাদের ক্রমতালিকায় অবস্থান ভালোই ছিল। আশা ছিল এই ক্রমতালিকায় অবস্থানের ভিত্তিতে তারা প্যারিস অলিম্পিক গেমসের কোটা জিতে নেবেন। বাস্তবে সেটাই হয়েছে। সোমবার আর্চরির দলগত বিভাগে পুরুষ এবং মহিলা উভয় বিভাগেই কোটা জিতেছে ভারতীয় দল। 'নন কোয়ালিফায়েড' দেশগুলোর মধ্যে অর্থাৎ যারা অলিম্পিক গেমসে সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করতে পারেননি তাদের মধ্যে ভারতীয় দল প্রথম স্থানে ছিল। সেই সুবাদেই ভারতীয় দল অলিম্পিক গেমসের কোটা জিতে নিল।

পরিমার্জিত ক্রমতালিকা ঘোষণা করা হয়েছে। আর সেখানেই পুরুষ ও মহিলা বিভাগে ভারতকে একটি করে কোটা দেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই খবরে বেজায় খুশি ভারতীয় ক্রীড়াপ্রেমীরা। আর্চারিতে দলগত বিভাগে ভারত জায়গা পাওয়াতে প্যারিস থেকে আরও একটি পদক জয়ের সম্ভাবনা তৈরি হলো। সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে জানা গিয়েছে 'নন কোয়ালিফায়েড' দেশগুলোর মধ্যে ভারত পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগেই শীর্ষ স্থানে থাকাতেই তাদের গেমসের টিকিট নিশ্চিত হয়েছে। প্যারিস ব্যক্তিগত ইভেন্ট তো বটেই, এর পাশাপাশি দলগত ও মিক্সড ইভেন্টেও ভারতীয় দল প্যারিসে অংশ নিতে পারবে। পুরুষ বিভাগে ভারতের পাশাপাশি চীনেরও কোটা নিশ্চিত হয়েছে। অন্যদিকে মহিলা বিভাগে ভারতের পাশাপাশি ইন্দোনেশিয়ার খেলা নিশ্চিত হয়েছে।

দলগত ইভেন্টে প্রতিটি বিভাগে ১২টি করে দল লড়াই করবে। মিক্সড ইভেন্টে পাঁচটি করে দল লড়াই করবে। প্রথমে অলিম্পিকের জন্য তিন লেগের কোয়ালিফায়ার হয়। এই কোয়ালিফায়ারে যারা কোয়ালিফাই করতে পারে না তাদের থেকে দুটি দেশকে অলিম্পিক গেমসে খেলতে সুযোগ দেওয়া হয়। পুরুষ বিভাগে গত বছরে জার্মানির বার্লিনে প্রথম কোয়ালিফায়ার অনুষ্ঠিত হয়। এতে দক্ষিণ কোরিয়া, তুরস্ক ও জাপান কোয়ালিফাই করে।

মহিলা বিভাগে জার্মানি ও মেক্সিকো কোয়ালিফাই করে। দ্বিতীয় লেগে একটি কন্টিনেন্টাল কোয়ালিফিকেশন অনুষ্ঠিত হয়। এশিয়া থেকে পুরুষ বিভাগে জায়গা পায় কাজাখস্তান। মহিলা বিভাগে জায়গা পায় দক্ষিণ কোরিয়া। অন্যদিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কলম্বিয়া কোয়ালিফাই করে ইউরোপ থেকে পুরুষ বিভাগে ইতালি এবং মহিলা বিভাগে নেদারল্যান্ডস যোগ্যতা অর্জন করে। শেষ অলিম্পিক কোয়ালিফায়ার অনুষ্ঠিত হয়। তুরস্কের অ্যান্টিলিয়াতে। মহিলা বিভাগে চীন মালয়েশিয়াস, গ্রেট ব্রিটেন ও চাইনিজ তাইপে এবং পুরুষ বিভাগে চাইনিজ তাইপে, গ্রেট ব্রিটেন ও মেক্সিকো কোয়ালিফাই করে। আসন্ন অলিম্পিক গেমস ভারতের দুই অভিজ্ঞ আর্চার তরুণদীপ রাই ও দীপিকা কুমারি দুজনের জন্য তাদের চতুর্থ অলিম্পিক গেমস হতে চলেছে। অঙ্কিতা ভগত, ভজন কৌর ও ধীরাজ বোম্মাদেভারা তাদের প্রথম অলিম্পিক গেমসে খেলবেন। প্রবীণ যাদব টানা দ্বিতীয়বার অলিম্পিক গেমসে খেলবেন।

আর ভারতীয় অলিম্পিক্সের ইতিহাসে অন্যতম সেরা ক্রীড়াবিদ বজরং পুনিয়া। শেষ টোকিয়ো অলিম্পিক গেমসে ভারতের হয়ে পদক জিতেছিলেন তিনি। কয়েকমাস আগেই তিনি জাতীয় অ্যান্টি ডোপিং এজেন্সি অর্থাৎ নাডার নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়েছিলেন। পরবর্তীতে নাডার তরফে জানানো হয়েছিল যতদিন না 'নোটিশ অব চার্জ' অর্থাৎ চার্জশিট দেওয়া হচ্ছে বজরং পুনিয়ার বিরুদ্ধে, ততদিন তাঁর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা সাময়িক স্থগিত করা হলো। এবার নাডার তরফে বজরঙের বিরুদ্ধে জারি করা হয়েছে চার্জশিট এবং পাশাপাশি ফের একবার নতুন করে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে বজরং পুনিয়ার উপরে।

বজরং পুনিয়া, নাডা এবং নাডার অ্যান্টি ডিসিপ্লিনারি ডোপিং প্যানেলের দেওয়া নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপিল করেছিলেন। গত ৩১ মে তাঁকে সাময়িক স্বস্তি দিয়ে চার্জশিট না দেওয়া পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা তোলা হয়েছিল। যা আবার লাগু করা হয়েছে। নাডার তরফে বজরংকে জানানো হয়েছে 'এই তথ্যকে আপনার বিরুদ্ধে ফর্ম্যাল নোটিশ হিসেবে ধরুন আপনি। জাতীয় অ্যান্টি ডোপিং নিয়মের (২০২১) আর্টিকেল ২.৩ নিয়মকে আপনি অগ্রাহ্য করেছেন। যার শাস্তিস্বরূপ আপনাকে প্রভিশনালি সাসপেন্ড করা হলো।'

বজরং পুনিয়ার হাতে ১১ জুলাই পর্যন্ত সময় রয়েছে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করার। বজরং বারবার দাবি করেছেন তিনি কখনও তাঁর মূত্রের নমুনা দিতে অস্বীকার করেননি। তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে তাঁকে ফাঁসানোর চেষ্টা হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য ছিল তিনি নাডাকে ইমেল করে জানতে চেয়েছিলেন কেন মেয়াদ উত্তীর্ণ কিটে তাঁকে মূত্রের নমুনা দিতে হবে? □

অভিপ্রায় থেকে ইচ্ছাপূরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অসমে 'মন্‌সা' নামে একটি স্বয়ং সহায়তা সমূহ বা সেল্ফ হেল্প গ্রুপ রয়েছে। এই গ্রুপের মাধ্যমে শহুরে ও গ্রামীণ এলাকাগুলিতে বহু মানুষ স্বাবলম্বী হয়ে উঠছেন। অসমের বহু মহিলা এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে উপকৃত। তাঁদের মধ্যে স্বনির্ভরতা অর্জনকারী একজন হলেন রূপা গোস্বামী। মন্‌সা নামক সেল্ফ হেল্প গ্রুপটির সহায়তায় 'অসম রাজ্য গ্রামীণ আজীবিকা মিশন'-এর মাধ্যমে তিনি ৩০ হাজার টাকা ঋণ হিসেবে পেয়েছিলেন। এই ঋণ গ্রহণের পর তিনি শুরু করলেন পশুপালনের কাজ। সেই কাজ শুরুর পর অতিবাহিত হয়েছে বেশ কিছুটা সময়। রূপা গোস্বামী আজ পুরোপুরি স্বাবলম্বী শুধু নন, আরও অনেককে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করে চলেছেন। অসমের লখিমপুর জেলার করুণাবাড়ি অঞ্চলে মন্‌সা স্বনির্ভর গোষ্ঠীটি সক্রিয়। অসম রাজ্য গ্রামীণ আজীবিকা মিশনের মতো প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণদানের ক্ষেত্রে এই সংস্থাটি যাবতীয় সহায়তা করে থাকে।

মন্‌সার সদস্য হওয়ার আগে অন্যান্য গ্রামীণ মহিলাদের মতোই রূপা গোস্বামীর জগৎ ছিল তাঁর বাড়ির চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মন্‌সার সদস্য পদ গ্রহণের পর তাদের কার্যক্রমের সঙ্গে তাঁর যোগদানের সুযোগ ঘটে। তাদের কার্যক্রমে শামিল হয়ে কয়েকটি বিষয়ে তিনি প্রশিক্ষণ লাভ করেন। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির পর সেই প্রশিক্ষণকে কাজে লাগিয়ে পরিবারের জন্য উপার্জনে সক্ষম হন রূপা। একজন আদর্শ গৃহিণী হিসেবে গৃহস্থালীর কাজকর্ম সামলে তার পাশাপাশি অন্যান্য কাজ করতে পারবেন— সেই আত্মবিশ্বাস তাঁর ছিল। স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে এই অন্য কাজ হিসেবে তিনি পশুপালনকে বেছে নিলেন। পশুপালনের কাজটি তাঁর কাছে অপেক্ষাকৃত সহজ মনে হয়েছিল। কাজটি তাঁর পছন্দেরও ছিল। পশুপালনের কাজই তাঁর জীবনে আনে আশাতীত সাফল্য। গোপালনকে তাঁর জীবিকা হিসেবে নির্বাচন করার পর প্রথম বারের ৩০ হাজার টাকার ঋণ দুধ বিক্রি করে তিনি পরিশোধ করেন। আর্থিক স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে তাঁর প্রথম পদক্ষেপের ক্ষেত্রে সহায়ক ছিল প্রথমবার পাওয়া এই ঋণ। ঋণ বাবদ অর্থ পরিশোধের পরেও কিছুটা অর্থ তিনি সঞ্চয় করেছিলেন। এর ফলে তাঁর মনোবল বহু গুণ বৃদ্ধি পায় এবং গোপালনের এই কাজের পরিধি বিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি দ্বিতীয়বার কিছু টাকা ধার হিসেবে নেন। তাঁর নেওয়া ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ লক্ষ টাকায়। ঋণের যাবতীয় অর্থ পরিশোধে তিনি সমর্থ হবেন সেই আত্মবিশ্বাস তাঁর ছিল।

বর্তমানে তাঁর কাছে সাতটি গোরু রয়েছে, যার মাধ্যমে প্রতিদিন তিনি ৪০ থেকে ৫০ লিটার দুধ পান। দুধ উৎপাদনের পর প্রতি লিটার দুধ ৫০ টাকা দামে তিনি বিক্রি করেন। এর পাশাপাশি দুগ্ধজাত পণ্য দই ও পনিরও তিনি প্রস্তুত করেন। তাঁর উৎপাদিত সামগ্রী স্থানীয় ভাবেই বিক্রি হয়। এই কারণে দুধ বা অন্য পণ্য বিক্রি নিয়ে তাঁর কোনোরকম ঝুটঝামেলা নেই। বিক্রিজনিত সমস্যা না থাকার ফলে তাঁর এই কাজের দ্রুত অগ্রগতি ঘটে চলেছে। প্রতি মাসে তাঁর আয় দাঁড়িয়েছে ৩৫-৪০ হাজার টাকা। আর্থিক স্বনির্ভরতার ইচ্ছাপূরণ হওয়ায় অর্থের জন্য আজ তাঁকে কারুর মুখাপেক্ষী হতে হয় না। অথচ কিছুদিন আগে পর্যন্ত তিনি স্বনির্ভরতার বৃত্তের বাইরে ছিলেন।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে ঋণ গ্রহণের পর তাঁর জীবন পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গে রূপা গোস্বামী বলেন— 'আমার মতো অসংখ্য মহিলার স্বপ্নপূরণ করে চলেছে মন্‌সা স্বনির্ভর গোষ্ঠী। এই কারণে দেশজুড়ে সমবায় সমিতিগুলিকে আরও দৃঢ় ও শক্তিশালী করে তোলা উচিত। সমিতিগুলির ভিত্তি মজবুত হলে সাধারণ মানুষও আর্থিক সচ্ছলতা অর্জন করবে'।

পশুপালনে সাফল্য লাভের কারণে রূপা গোস্বামীর আত্মবিশ্বাস বর্তমানে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। রোজ ১৫০ লিটার দুধ উৎপাদনের লক্ষ্যে পশুপালন হলো তাঁর ভবিষ্যৎ ইচ্ছা ও পরিকল্পনা। দুধ ও দুগ্ধজাত অন্যান্য পণ্যের চাহিদা সবসময় থাকে। এই জন্য ডেয়ারি ব্যবসা কখনও ক্ষতির মুখে পড়ে না বলে তিনি জানান। তিনি বলেন যে এই কারণে গ্রামীণ মহিলা, যাঁরা সরাসরি কোনো কর্মক্ষেত্রে যুক্ত নন, তাদের পশুপালনের কাজে যুক্ত হওয়া উচিত। চেনা ছকের বাইরে গিয়ে পশুপালনের মাধ্যমে আত্মনির্ভর হয়ে ওঠা রূপা গোস্বামী ভারতের গ্রামাঞ্চলের মহিলা ও গৃহবধূদের কাছে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ। □

উকিলের বুদ্ধি

সুকুমার রায়

গরিব চাষা, তার নামে মহাজন নালিশ করেছে। বেচারা কবে তার কাছে ২৫ টাকা নিয়েছিল, সুদে-আসলে তা এখন ৫০০ টাকায় দাড়িয়েছে। চাষা অনেক কষ্টে ১০০ টাকা জোগাড় করেছে; কিন্তু মহাজন বলছে, '৫০০ টাকার এক পয়সাও কম নয়; দিতে না পারো তো জেলে যাও।' সুতরাং চাষার আর

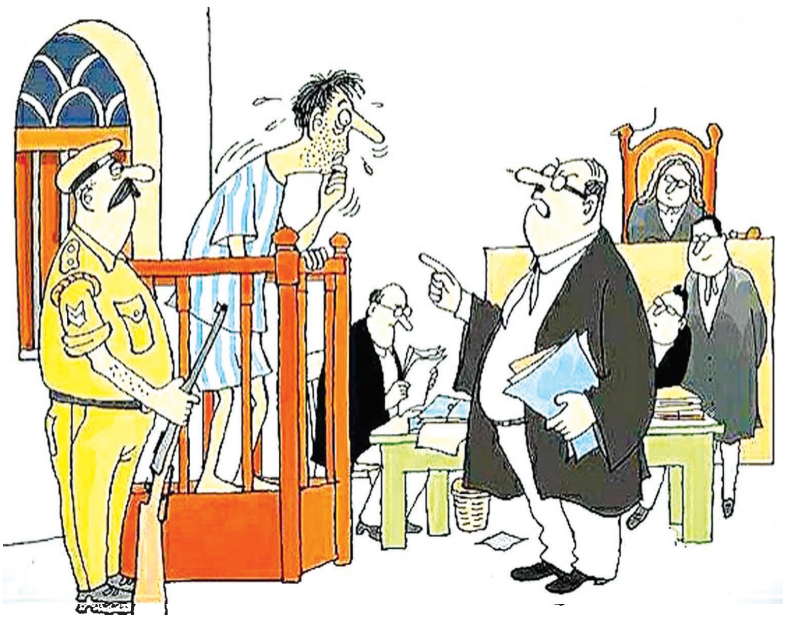

রক্ষা নাই।

এমন সময় শ্যামলা মাথায় চশমা চোখে তুখোড় বুদ্ধি উকিল এসে বললেন, 'এই ১০০ টাকা আমায় দিলে, তোমার বাঁচবার উপায় করতে পারি।'

চাষা তার হাতে ধরল, পায়ে ধরল, বলল, 'আমায় বাঁচিয়ে দিন।'

উকিল ললেন, 'তবে শোন, আমার ফন্দি বলি। যখন আদালতে কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াবে, তখন বাপু হে, কথাটথা কয়ো না। যে যা খুশি বলুক, গাল দিক আর প্রশ্ন করুক, তুমি জবাবটি দেবে না, খালি পাঁঠা মতো 'ব্যা' করবে। তা যদি করতে পারো, ত হালে আমি তোমায় খালাস করিয়ে দেব।'

চাষা বললে, 'আপনি কর্তা যা বলেন, তাতেই আমি রাজি।'

আদালতে মহাজনের মস্ত উকিল, চাষাকে এক ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি সাত বছর আগে ২৫ টাকা কর্জ নিয়েছিলে?

চাষা তার মুখের দিকে চেয়ে বলল – ব্যা।

উকিল বললেন, খবরদার! বল, নিয়েছিলে কিনা? চাষা বলল– ব্যা।

উকিল বললেন, হুজুর, আসামির বেয়াদপি দেখুন। হাকিম রেগে বললেন, ফের যদি অমন করিস, তোকে আমিই ফাটক দেব। চাষা অত্যন্ত ভয় পেয়ে কাঁদ কাঁদ হয়ে বসল – ব্যা -ব্যা।

হাকিম বললেন, লোকটা কি পাগল নাকি?

তখন চাষার উকিল উঠে বললেন, হুজুর ও কী আর আজকের পাগল, ও বহুকালের পাগল, জন্ম অবধি পাগল। ওর কী কোনো বুদ্ধি আছে, না কাণ্ডজ্ঞান আছে? ও আবার কর্জ নেবে কী! ও কি কখনো খত লিখতে পারে নাকি? আর পাগলের খত লিখলেই-বা কী? দেখুন দেখুন, এই হতভাগা মহাজনটার কাণ্ড দেখুন তো! ইচ্ছে করে জেনেশুনে পাগলটাকে ঠকিয়ে নেওয়ার মতলব কছে। আরে, ওর কি মাথার ঠিক আছে? এরা বলেছে, এইখানে একটা আঙ্গুলের টিপ দে, পাগল কী জানে, সে অমনি টিপ দিয়েছে। এই তো ব্যাপার!

দুই উকিলে ঝগড়া বেধে গেল। হাকিম খানিক শুনেটুনে বললেন, মোকদ্দমা ডিসমিস। মহাজনের তো চক্ষুস্থির। সে আদালতের বাইরে এসে চাষাকে বললে, আচ্ছা, না হয় তোর ৪০০ টাকা ছেড়েই দিলাম, ওই ১০০ টাকাই দে।

চাষা বলল– ব্যা! মহাজন যতই বলেন, ততই বোঝান, চাষা পাঁঠার বুলি কিছুতেই ছাড়ে না।। মহাজন রেগেমেগে বলে গেল, দেখে নেব, আমার টাকা তুই কেমন করে হজম করিস।

চাষা তার পোঁটলা নিয়ে গ্রামে ফিরতে চলেছে। এমন সময় তার উকিল এসে ধরল, যাচ্ছ কোথায় বাপু? আমার পাওনাটা আগে চুকিয়ে যাও। ১০০ টাকা রফা হয়েছিল, এখন মোকদ্দমা তো জিতিয়ে দিলাম।

চাষা অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল – ব্যা!

উকিল বললেন, বাপু হে, ওসব চালাকি খাটবে না, টাকাটি বের করো।

চাষা বোকার মতো মুখ করে আবার বলল – ব্যা!

উকিল তাকে নরম গরম অনেক কথাই শোনাল, কিন্তু চাষার মুখে ওই এক জবাব! তখন উকিল বলল, হতভাগা গোমুখ্যু পাড়াগেঁয়ে ভূত, তোর পেটে অ্যাতো শয়তানি, কে জানে! আগে যদি জানতুম তাহলে পোঁটলাসুদ্ধু টাকাগুলো আটকে রাখতাম।

বুদ্ধিমান উকিলের আর দক্ষিণা পাওয়া হলো না।

পাহাড়-পর্বত

দক্ষিণবঙ্গের পাহাড়

দক্ষিণবঙ্গ মূলত সমতলভূমি হলেও কয়েকটি জেলায় উল্লেখযোগ্য পাহাড় য়েছে। যেমন। পুরুলিয়া জেলায় অযোধ্যা পাহাড়, পরেশনাথ পাহাড়, জয়চণ্ডী পাহাড়, পাঞ্চেত পাহাড়, ভাণ্ডারী পাহাড়। বাঁকুড়া জেলায় শুশুনিয়া পাহাড়, কোড়ো পাহাড়, মশক পাহাড় ও বিহারীনাথ পাহাড়। বীরভূম জেলায় মামাভাগ্নে পাহাড়, মথুরখালি পাহাড়। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ঠাকুরান পাহাড় ও বেলপাহাড়ি পাহাড়।

এসো সংস্কৃত শিখি-৩০

আ-কারান্ত, স্ত্রীলিঙ্গে

সীতা–সীতয়া: (সীতা-সীতার)

সীতয়া: পতি: রাম:–সীতার পতি রাম।

অভ্যাস করি -

গীতার—গীতয়া:,সোমার-সোমায়া:,গায়িকার-গায়িকা, সুপ্রিয়ার-সুপ্রিয়া:, মনীষার- মনীষায়া: ।

অভ্যাস করি –

কৌল্যায়া: পতি দশরথ: । সুমিত্রয়া পুত্র: শত্রুঘ্ন: । দুর্গায়া পুত্রী সরস্বতী। আহল্যায়া: পতি গৌতম: । স্নেহায়া: শিক্ষক : অরবিন্দ: ।

প্রয়োগ করি–

বিঃ দ্রঃ – আ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গে নামের সঙ্গে য়াঃ /য়া: যুক্ত হবে। অনুরূপ বাক্য তৈরি করতে হবে।

ভালো কথা

বৃক্ষরোপণ

গত বছরও প্রচণ্ড গরম পড়েছিল। তখন বড়োরা বলেছিল, আগামী বছর আরও গরম বাড়বে। তখনই ঠিক হয়েছিল, আগামী বছর গাছ লাগাতে হবে। সেই মতো এবার গত সপ্তাহে গ্রামের প্রত্যেক পরিবারকে নিজেদের জায়গায় দশটি করে গাছ লাগাতে হয়েছে। ব্লক অফিস থেকে চারাগাছের ব্যবস্থা করেছিল। আমরা দশটা নিমগাছ লাগিয়েছি। ঠাকুমা বলেছিল, নিমগাছের হাওয়া খুব উপকারী। সবাই নিজেদের গাছ বেড়া দিয়ে ঘিরে দিয়েছে।

সমীর কুমার মাহাত, নবম শ্রেণী, মানবাজার, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ড়ি গা খি জ	(১) মূ সে ক বা জ ল ন
(২) ঠ ল জ রা	(২) য় কু ম হা শ ঠা র

১ জুলাই সংখ্যার উত্তর

(১) যোগসাধনা (২) রাজভবন

১ জুলাই সংখ্যার উত্তর

(১) সাজপোশাক (২) সাতসকাল

উত্তরদাতার নাম

(১) শ্রাবণী হালদার, ক্যানিং, দ: ২৪ পরগনা, (২) মালতী মাহাতো, বরাবাজার, পুরুলিয়া। (৩) স্বপন সরদার, বসিরহাট, উ: ২৪ পরগনা, (৪) বিপ্লব সরকার, গাজোল, মালদা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

With Best Compliments from -

A
Well wisher

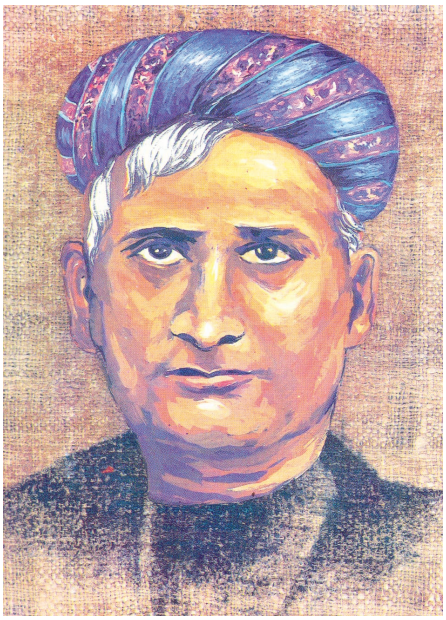

রূপনারায়ণের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র

ডাঃ কনক চৌধুরী

ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী তাঁর The Extremist Challenge গ্রন্থে (বাংলা অনুবাদ 'ভারতের মুক্তিসংগ্রামে চরমপন্থী') ভারতীয় রাজনীতিতে চরমপন্থী মতবাদের মৌলিক পটভূমি তৈরির পিছনে তিনজন ব্যক্তিত্বের ভূমিকার কথা বলেছিলেন— বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ ও দয়ানন্দ সরস্বতী। এদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে 'হিন্দু জাতীয়তাবাদী' আখ্যা দেওয়া আসলে ইতিহাসের একটি অপব্যাখ্যা। তা খুবই পরিকল্পিত পথে ইতিহাসের বিকৃতভাষ্য। এই প্রেক্ষাপটেই মূলত এই পর্যালোচনা। বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করতেন যে জাতীয়তা বিদেশ থেকে আমদানি করা কোনো তত্ত্ব নয়, এ দেশের আবহাওয়া, মানুষের শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্যই তার ভিত্তি হতে পারে। এই মনীষীর ছাত্রজীবন, চাকুরিজীবন ও লেখকজীবন জুড়ে আমরা এর দৃঢ় প্রতিফলন দেখি। বঙ্কিমচন্দ্র, আনন্দমঠ ও বন্দেমাতরম্, যে তিনটি শব্দ প্রায় ভারতীয় জাতীয়তার সঙ্গে সমার্থক, সেগুলি নিয়ে কোনো আলোচনা শুরু হলেই দেখি তথাকথিত প্রগতিশীলদের কেমন একটা অস্বস্তি শুরু হয়ে যায়! একদল এটা বলতে নেমে পড়েন, 'বন্দেমাতরমে' যেহেতু দেশকে 'মা' হিসেবে বন্দনা করাটা নাকি 'ইসলাম-বিরোধী'! অথচ, বঙ্গজননীর সাতকোটি সন্তানকেই বঙ্কিমচন্দ্র স্বাধীনতার সংগ্রামে আহ্বান করেছিলেন। বন্দেমাতরম কোনো হিন্দু দেব-দেবীর পূজার গান নয়। এখানে দেশকে বন্দনা করা হয়েছে।

আসলে ভারতে 'বুদ্ধিজীবী'দের নির্মাণে এবং যে কোনো 'কাল্ট' তৈরিতে বামপন্থীদের প্রভাব এত বেশি এবং বামমনস্কতা এত প্রবল, যে 'স্টিরিওটাইপ'-এর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রকে ঠিক মানিয়ে নিতে পারেননি অনেক মহলই। এমনিতে প্রেসিডেন্সি কলেজের এই উজ্জ্বল, মেধাবী ছাত্র প্রতিভার বিচারে এতটাই গনগনে আগুন যে তাতে অনেকের হাত পুড়ে যায়! বঙ্কিম-জীবনীকার অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য চমৎকার লিখেছেন, 'আনন্দমঠের সন্ন্যাসীরা মুসলমান রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হলে আমরা বলি বঙ্কিম মুসলমান বিদ্বেষী ছিলেন, বঙ্কিম যখন উপন্যাসের শেষে মহাপুরুষের মুখ দিয়ে হিন্দু ধর্মের সুতীব্র সমালোচনা করে হিন্দু সন্তানদের হাত থেকে রাজ্যশাসনের অধিকার কেড়ে নেন তখন আমরা তাঁকে হিন্দুবিদ্বেষী বলি না কেন? হিন্দুধর্মের ত্রুটি-বিচ্যুতি-দুর্বলতার সমালোচনা করলে যদি হিন্দু-বিদ্বেষী না হয় তবে অত্যাচারী মুসলমান রাজশাসনের বিরুদ্ধাচরণ করলেই 'সাম্প্রদায়িক' আখ্যায় কলঙ্কিত হতে হবে কেন? আনন্দমঠের সন্ন্যাসীদের সব কাজ নিশ্চয় পছন্দ করেননি বঙ্কিমচন্দ্র। তা যদি করতেন তাহলে তাদের হাত থেকে দেশ শাসনের অধিকার তিনি কেড়ে নিতেন না। আনন্দমঠ বঙ্কিম সন্ন্যাসী বিদ্রোহের চিত্র সবিস্তারে এঁকেছেন; এবং উপন্যাসের সমাপ্তিতে এসে তাঁর অসামান্য সত্যনিষ্ঠ নিরপেক্ষ বিচারশক্তির পরিচয় দিয়েছেন।'

বঙ্কিমচন্দ্র কি মুসলমান-বিরোধী ছিলেন? কিছু গবেষক বঙ্কিমকে মুসলমান বিরোধী, সাম্প্রদায়িক হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বঙ্কিম নিজেই 'বঙ্গদর্শন'-এ ১২৮০ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় লিখেছেন যে, 'বঙ্গপ্রদেশ হিন্দু-মুসলমানদের দেশ, একা হিন্দুদের দেশ নহে।' ১৯৩৮-এ বঙ্কিম জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় রেজাউল করীমের প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি সংকলন আকারে ১৯৪৪ সালে 'বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। মুসলিম লিগের প্ররোচনায় কলকাতার রাস্তায় শত শত কপি আনন্দমঠ পোড়ানোর প্রতিবাদ করে রেজাউল করীম লিখেছিলেন, 'আনন্দমঠকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া ইহারা যে মনোবৃত্তির পরিচয় দিলেন তাহা অতীব জঘন্য। স্বাধীন চিন্তার পথ রুদ্ধ করিবার জন্য এই যে প্রচেষ্টা, ইহা ইসলামকে উদ্ধার করিবে না। ইহা লইয়া যাইবে মুসলমানকে অধঃপতনের দিকে... ভূলুণ্ঠিত হইল মুসলমানের স্বাধীন চিন্তার শক্তি।' তিনি আরও লিখেছেন, 'আজ আনন্দমঠ এর বিরুদ্ধে যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা মুসলমানদের অভাব-অভিযোগ দূর করিবার উদ্দেশ্যে নহে। তাহার মূল কারণ মুসলমান যাহাতে মুক্তি আন্দোলনে

যোগ দিতে না পারে তাহার জন্য কতকগুলি ছল বাহির করিবার দুরভিসন্ধি।'

বন্দেমাতরম প্রসঙ্গে তিনি লেখেন, 'অন্যান্য দেশের মুসলমানরা এরূপ গান ব্যবহার করিবার মতো পরিস্থিতি পাইলে ধন্য হইয়া যাইতেন। তাই তাঁর মতে বঙ্কিমের নিকট যদি বাঙ্গালি ঋণী হয়, বাংলা ভাষা ঋণী হয়, তবে বাঙ্গালি মুসলমানও সমভাবে তাঁহার নিকট ঋণী, সর্বাংশে ঋণী।' 'বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান' সমাজ গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ যদুনাথ সরকার। সেখানে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও বন্দেমাতরমকে ইসলাম বিরোধী সাজানোর মুসলিম লিগের চক্রান্তের বিরোধিতা করেছিলেন। 'বাঙ্গলার ইতিহাস' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'সাহেবরা যদি পাখি মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্তু বাঙ্গলার ইতিহাস নাই।' বঙ্কিম বুঝেছিলেন সঠিক ইতিহাস-জ্ঞান একটি জাতির উত্থানের জন্য আবশ্যিক। আর মিথ্যা, বিকৃত ইতিহাস যে একটি জাতিকে ভিতর থেকে ফাঁপা করে দিতে পারে তাও তিনি বলেছেন। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'ঐতিহাসিক গবেষণায় বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে ইউরোপে যখন বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস-চর্চার শৈশবকাল এবং বঙ্গে যখন ইতিহাস চর্চা প্রায় শুরুই হয়নি বলা যায়, সেই সময় বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস-চেতনা ও ইতিহাস-লেখার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

বঙ্কিম মিনহাজ উস সিরাজের তবকাত-ই-নাসিরী-তে প্রাপ্ত বখতিয়ার খিলজির সতেরো অশ্বারোহী নিয়ে বঙ্গ-বিজয়ের কাহিনিতে কোনোদিন বিশ্বাস করেননি। তিনি বলেছিলেন, 'সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখতিয়ার খিলজি বাঙ্গলা জয় করিয়াছিল, একথা যে বাঙ্গালি বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার।' তিনি এই ঘটনাকে অসম্ভব বলে মনে করেন এবং বখতিয়ার যে বঙ্গের খুব কম অংশকেই দখল করতে পেরেছিলেন, তাও উল্লেখ করেন। বর্তমানে আমরা জানি যে বঙ্কিমের দাবি ঐতিহাসিকভাবে সত্য। বখতিয়ার শুধু কয়েক বছরের জন্য বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবঙ্গের কিছু অংশ দখলে রাখতে পেরেছিল। বাকি উভয় বঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চলই লক্ষ্মণ সেনের পুত্র বিশ্বরূপ সেন, কেশব সেন-সহ তাঁর উত্তরাধিকারীরা বহু বছর যাবৎ শাসন করেন। মৃণালিনী উপন্যাসেও বঙ্কিম বখতিয়ার-সংক্রান্ত কিংবদন্তীটির বিরোধিতা করেছেন।

অমলেশ ত্রিপাঠী লিখেছেন, 'বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী কখনোই সৎ মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেনি। তাঁর রচনায় নিন্দিত হয়েছিলেন কেবলমাত্র অত্যাচারী বা অপদার্থ মুসলমান শাসকরা। তাঁর বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনা চলত যদি তিনি আকবর বা হুসেন শাহের মতো কোনো সুশাসকের কুৎসা করতেন।' পশুপতি, ভবানন্দ, গঙ্গারাম, সীতারাম প্রভৃতি হিন্দু চরিত্রের খারাপ দিকও তিনি তুলে ধরেছেন। যে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ১২৮৭ সনের চৈত্রে 'আনন্দমঠ' ছাপা শুরু হয়, সেই একই পত্রিকায় তার তিন মাস আগে অর্থাৎ পৌষ সংখ্যায় 'বাঙ্গালি বলা যায়, যাহারা বাংলাদেশে বাস করেন, বাংলা ভাষায় কথা কয়, তাহাদিগের মধ্যে অর্ধেক মুসলমান'। মনে রাখবেন, এর আগে এই একই পত্রিকায় 'বঙ্গদর্শন'-এ ১২৭৯ সনে চারটে সংখ্যা জুড়ে ছাপা হয়েছিল তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'বঙ্গপ্রদেশের কৃষক'। এবং সেই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র একই সঙ্গে হাসিম শেখ এবং রামা কৈবর্ত, অর্থাৎ বাঙ্গলার মুসলমান এবং হিন্দু প্রজা, কি দুর্দশার জীবনযাপন করছে, তার সুনিপুণ ছবি আঁকেন। পশ্চিমবঙ্গের কৃষকের জীবন- যাপনের এই ছবি ক্যানভাসে আঁকার সময় তিনি হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে কোনও ভেদাভেদ তো করেনইনি, বরং বারে বারে 'ছয় কোটি সুখী প্রজা' দেখার কথা বলেছেন।

তাঁর নিজের কথায়, 'দুই চারিজন অতি ধনবান ব্যক্তির পরিবর্তে' 'ছয় কোটি সুখী প্রজা' দেশের মঙ্গল এবং শ্রীবৃদ্ধিকে সূচিত করবে। এবং 'বন্দেমাতরম'-এর স্রষ্টা স্পষ্ট করে বারবার বলেছেন, এই ছয় কোটি প্রজার মধ্যে তিন কোটি হাসিম শেখ আর তিন কোটি রামা কৈবর্ত। বঙ্কিমচন্দ্র নিজ দেশীয় ঐতিহ্য, ধর্ম, জাতীয়তাবোধ প্রভৃতির ওপর জোর দিলেও কিছু অতি বামপন্থী যেভাবে তাকে ব্রাহ্মণ্যবাদী, মনুবাদী বা এলিটিস্ট হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেন তা কখনোই ঠিক নয়। কারণ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ও বর্ণের কথা আমরা তার লেখায় পাই, তা আগেই উল্লেখ করেছি। তৎকালীন সমাজের অধিকাংশ বিশিষ্ট ব্যক্তি যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশংসায় পঞ্চমুখ— তখন তিনি এই ব্যবস্থার ফলে কৃষকদের দুর্দশা নিয়ে কলম ধরেছিলেন। মনে রাখতে হবে যে, বঙ্গদেশের কৃষকের অধিকাংশই ছিল মুসলমান এবং বাকিরা তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দু। কিন্তু এদের জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন উচ্চকিত। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' রচনার কথা উল্লেখ না করলেই নয়।

বইটি প্রকাশিত হবার পর ভীষণ দ্রুততায় শ্রীকৃষ্ণই হয়ে ওঠেন তৎকালীন প্রতিটি চরমপন্থী ব্যক্তির আদর্শ পুরুষ। এই শ্রীকৃষ্ণ অতি দূরে সরে থাকা, নির্লিপ্ত ঈশ্বর নন। তিনি ধর্মসংস্থাপনের জন্য দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের কাজে সদা তৎপর। শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলীর মধ্যে বঙ্গিমচন্দ্র সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন তাঁর অতুলনীয় নেতৃ-প্রতিভার ওপর, তাঁর সামরিক জ্ঞান ও সাম্রাজ্য সংগঠনী কুশলতার ওপর। শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্ন দেখেছিলেন এক ঐক্যবস্থ ভারতবর্ষের, আর এই স্বপ্নকে পূরণ করার জন্যই কুরুক্ষেত্রে অগণিত ক্ষুদ্র সামন্ত রাজাকে বিনাশ করে এক সুবিশাল সংহত ধর্মরাজ্য সৃষ্টি করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের এই ধর্মরাজ্যের সঙ্গে প্রতীচ্যের পররাজ্যলিপ্সু উগ্র

জাতীয়তাবাদের কোনো সাদৃশ্য ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র প্রকাশিত হবার পর তিলক রচনা করেন গীতার মারাঠি ভাষ্য, অরবিন্দ লিখেছেন গীতার দীর্ঘ ভূমিকা, লাজপত রায় উর্দু ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের জীবনী প্রণয়ন করলেন, ভক্তিযোগের ব্যাখ্যা লিখেছেন অশ্বিনী কুমার দত্ত, ব্রাহ্ম বিপিনচন্দ্র পাল শ্রীকৃষ্ণকে 'ভারত-আত্মা' হিসেবে অভিহিত করেন, এমনকী ক্যাথলিক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় লিখে ফেললেন— শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব। এতটাই ছিল বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্রের প্রভাব। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে ব্রিটিশ ভারতে কংগ্রেসের নরমপন্থীদের নীতি ও কর্মপন্থার তীক্ষ্ণ সমালোচনা করে বঙ্কিমচন্দ্রই চরমপন্থার উত্থানের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন। কমলাকান্তের দপ্তরে 'পলিটিক্স' রচনায় তিনি কমলাকান্তের মুখ দিয়ে নরমপন্থীদের সমালোচনা করে বলিয়েছিলেন, 'জয় রাধে কৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গো! ইহাই আমাদের পলিটিক্স।' তিনি এই প্রবন্ধে কলুর পুত্র সংক্রান্ত একটি গল্পে নরমপন্থীদের রাজনীতিকে 'কুক্কুর জাতীয় রাজনীতির' সঙ্গে তুলনা করেন এবং এর পরিবর্তে 'বৃষ জাতীয় রাজনীতি' গ্রহণ করার কথা বলেন।

জীবনের শেষ উপন্যাস 'সীতারাম'-এ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মুসলমান ফকির চাঁদশাহের মুখ দিয়ে সীতারামের উদ্দেশ্যে যে কথাগুলি বলেছিলেন, তা কি আমরা মন দিয়ে পড়েছি? 'ফকির বলিল, বাবা! শুনিতে পাই, তুমি হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতে আসিয়াছো, কিন্তু অত দেশাচারের বশীভূত হইলে, তোমার হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করা হইবে না। তুমি যদি হিন্দু মুসলমান সমান না দেখ, তবে এই হিন্দু মুসলমানের দেশে তুমি রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না। তোমার রাজ্যও ধর্মরাজ্য না হইয়া পাপের রাজ্য হইবে।' যদি পড়ে থাকি, তাহলে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে কোন যুক্তিতে বলবো তিনি মুসলমান- বিরোধী ছিলেন? এবং 'বন্দেমাতরম'-এর স্রষ্টাকে কোন ঐতিহাসিক ভিত্তিতে 'সাম্প্রদায়িক' বলে আখ্যায়িত করে রাখব? বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৮৪তম জন্মবার্ষিকী বছরে দাঁড়িয়ে বোধহয় এটাই আজ সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন। 'রাজসিংহ' উপন্যাসের উপসংহারে 'গ্রন্থকারের নিবেদন'— অংশে বঙ্কিমচন্দ্র যে কথা বলেছিলেন, আসলে সেটাই তাঁর জীবনের, সাহিত্যকীর্তির মূল মন্ত্র। তিনি লিখেছেন, 'গ্রন্থকারের বিনীত নিবেদন এই যে, কোনো পাঠক না মনে করেন যে, হিন্দু মুসলমানের কোনো প্রকার তারতম্য নির্দেশ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

হিন্দু হইলেই ভালো হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না, অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভালো হয় না। ভালো-মন্দ উভয়ের মধ্যে আছে। বরং ইহাতে স্বীকার করিতে হয় যে, যখন মুসলমান এত শতাব্দী ভারতবর্ষের প্রভু ছিল, তখন রাজকীয় গুণে মুসলমান সমসাময়িক হিন্দুদের অপেক্ষা অবশ্য শ্রেষ্ঠ ছিল। কিন্তু ইহাও সত্য নহে যে, সকল মুসলমান রাজা সকল হিন্দু রাজা অপেক্ষা রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ। অনেক স্থলে হিন্দু রাজা মুসলমান অপেক্ষা রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম আছে— হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, সেই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম নাই— হিন্দু হউক, মুসলমান হউক— সেই নিকৃষ্ট।' এই স্পষ্টবাদিতা এবং যুক্তি বিশ্লেষণের জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র সব সময় স্মরণীয় এবং ভারতীয় জাতীয়তাবোধের পথপ্রদর্শক।

প্রচলিত 'হিন্দুত্ববাদ'-এর মাপকাঠিতে ফেলে তাঁকে মাপতে যাওয়াটা যতটাই মূর্খামি, ততটাই অমার্জনীয় 'দুর্গেশনন্দিনী'-র লেখককে 'সাম্প্রদায়িক' তকমা দেওয়া। ভারতীয় জাতীয়তাবোধের উন্মেষে বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকাকে বিশ্লেষণ করতে হবে একেবারে নির্মোহ ভাবে এবং সেই সময়ের বাস্তবতাকে স্মরণে রেখে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই বাস্তবতাকে অনুসরণ করে যদি আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকে বিশ্লেষণ করি এবং তাঁর লেখাকে অনুধাবন করি তা হলেই 'আনন্দমঠ'-এর গুরুত্ব নির্ধারণে আমরা কোনও ভুল করব না। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শুধু সাহিত্যসম্রাট নন তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের ভগীরথ। তাঁর রচনার মানবিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও দার্শনিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ভারতবর্ষের জাতীয়তাবোধের উত্থানের পিছনে তাঁর রচনাগুলি ছিল অনস্বীকার্য। কিন্তু তিনি কি তাঁর যথার্থ স্বীকৃতি পেয়েছেন? তাঁর এই অবদানগুলিকে নিয়ে কি যথেষ্ট চর্চা হয়েছে? ভারতবর্ষের জাতীয়তাবোধের প্রতিভূ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রকে শুধুমাত্র জাদুঘর আর পাঠাগারের চারদেওয়ালে বন্দি না করে সবার মাঝে মিলিয়ে দেওয়াতেই বোধহয় ওই মহৎ জীবনের স্বার্থকতা। আশা রইলো, রূপনারায়ণ নদের ঢেউ আবার পলি নিয়ে আসবে আমাদের সবার প্রাণে। □

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

বালক-বুদ্ধি

অজয় ভট্টাচার্য

লোকসভায় রাষ্ট্রপতির ধন্যাবাদ জ্ঞাপন বিতর্কে রাহুল গান্ধী বুঝিয়ে দিলেন যে তিনি এখনও পরিণত হতে পারেননি। এতদিনে তিনি পাপ্পু থেকে বালক-বুদ্ধি হয়েছেন মাত্র। তার প্রমাণও দিলেন লোকসভার প্রথম অধিবেশনে। সরকার পক্ষের হয়ে জবাবি ভাষণ দিতে উঠে দাঁড়িয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। রাহুল গান্ধী ডেকে নিলেন তাঁর অনুগামী সাংসদদের। উদ্দেশ্য ছিল হই-হট্টগোল বাঁধিয়ে প্রধানমন্ত্রীর জবাবি ভাষণে বাধা দেওয়া। অনবরত স্লোগান চলতে লাগলো প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে। এমন সময় প্রধানমন্ত্রী এক গ্লাস জল বাড়িয়ে দিলেন স্লোগানরত এক সাংসদের দিকে। যেন বলতে চাইলেন, 'স্লোগান দিতে দিতে আপনার কণ্ঠ শুকিয়ে এসেছে। তাই গলাটা একটু ভিজিয়ে নিন। তাহলে আপনি আমার বিরুদ্ধে আরও উচ্চস্বরে আওয়াজ তুলতে পারবেন।' এটাই হলো হিন্দুত্বের উচ্চমার্গের আদর্শ। যে আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ রাহুল গান্ধী পাননি। কারণ তাঁর মামার বাড়ি ইতালিতে। শিক্ষাদীক্ষার অনেকটাই বিদেশে। এখনও কারণে-অকারণে ছুটে যান বিদেশে। পিতা রাজীব গান্ধী, মাতা 'এদভিগ এন্তোনিয়া অ্যালবিনা মাইনো' থেকে সোনিয়া মাইনো, ওরফে সোনিয়া গান্ধী। ঠাকুমা হিন্দু, ঠাকুরদা ছিলেন পার্সি। এই তথ্যটুকুই বুঝিয়ে দেয়, কেন তিনি সংসদে দাঁড়িয়ে হিন্দু ধর্মকে কটাক্ষ করতে পারেন। উলটোদিকে নরেন্দ্র মোদী বুঝিয়ে দিলেন কেন তিনি এ দেশের ব্যতিক্রমী প্রধানমন্ত্রী। সংসদে দাঁড়িয়ে নরেন্দ্র মোদী যে বিরল নিদর্শন স্থাপন করলেন তার মর্মার্থ বোঝাতে একটি প্রাসঙ্গিক গল্পের কথা মনে পড়ে।

একদা এক তপস্বী, স্রোতস্বিনী গঙ্গার জলে একটি কাঁকড়াবিছেকে ভেসে যেতে দেখেন। বিছেটিকে তিনি জল থেকে উদ্ধার করে তুলে দিলেন পাড়ে। কিন্তু বিছেটি দংশন করল তাঁকে। শক্ত পাথরের ঢাল বেয়ে চলতে চলতে বিছেটি আবার গঙ্গার জলে পড়ে যায়। তপস্বী আবারও তাকে উদ্ধার করে তুলে দিলেন পাড়ে। বিছেটি এবারও দংশন করল তাঁকে। ঘটনাটি দেখে তাঁর এক শিষ্য বলল, হে ঋষিবর, আপনি বিছেটিকে কেন বার বার উদ্ধার করছেন? দেখছেন না, বিছেটি আপনাকে বার বার দংশন করছে! উত্তরে তিনি বললেন, বিছের ধর্ম হলো হুল ফোটানো, কিন্তু মানুষের ধর্ম হলো বিপদগ্রস্তকে উদ্ধার করা। এটাই হলো হিন্দুত্বের উচ্চমার্গের আদর্শ, যে আদর্শে পুষ্ট হয়েছেন নরেন্দ্র মোদী । সে আদর্শ রাহুলের বোঝার কথা নয়। কারণ সে এখনও বালক-বুদ্ধি সম্পন্ন। সংসদে রাহুল অ্যান্ড কোম্পানির আচরণ কাঁকড়া বিছের মতো। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীর আচরণ তপস্বী ঋষিবরের মতো। বাঁদর যেমন তিড়িং-বিড়িং করে, সংসদে রাহুলের আচরণ অনেকটা তেমনই। কারণ এতদিনের প্রচেষ্টায় সে বিরোধী দলনেতা হয়েছে। তাই পদের গরিমা দেখাবার তাগিদ অনেক বেশি। গণতন্ত্রে শক্তিশালী বিরোধী দলের প্রয়োজন আছে ঠিকই, কিন্তু উপদ্রব সৃষ্টিকারী বিরোধী দল গণতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকারক। কথায় বলে 'Morning shows the day', তাই আগামীদিনে রাহুলের এহেন ছেলেমানুষি আচরণ কোথায় গিয়ে ঠেকবে তা ভাবলে শঙ্কা জাগে। ১৩টি রাজ্যে শূন্য পেয়েও তিনি নিরানব্বইয়ের গর্বে গর্বিত। তিন-তিনবার ফেল করেও খড়কুটো ধরে ৯৯ পেয়ে তিনি খুশি। প্রতি মাসে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৮০০০ টাকা দেওয়ার ভাঁওতা দিয়ে, তিনবারের প্রচেষ্টাতেও সেঞ্চুরি করতে পারেনি। অথচ তাঁর লম্প-ঝম্প দেখে মনে হচ্ছে যেন তিনি দেশ জয় করে বসে আছেন। রাহুলের এহেন ভুল রাজনৈতিক পদক্ষেপের জন্য কংগ্রেসকে ভুগতে হয়েছে বারবার। যেমন, উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়ের শারীরিক অঙ্গভঙ্গির মিমিক্রি মুঠোফোনে বন্দি করে, সেই ভিডিয়ো ছড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় রাহুলের ভূমিকা রাজনীতিতে আত্মহননকারী হয়েছিল। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান তথা উপরাষ্ট্রপতির শারীরিক ভঙ্গিমা নকল করে হাসিঠাট্টা করার মধ্যে যে ভয়ংকর কুরুচি ছিল তা বোঝার ক্ষমতা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে যতটা না প্রত্যাশিত ছিল, তার চাইতেও বেশি প্রত্যাশিত ছিল কংগ্রেস দলের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নেতা রাহুলের কাছে। মিমিক্রির সেই দৃশ্যটি এখনও মনে থাকবে অনেকের। ধনকড়ের শারীরিক ভঙ্গিমা অভিনয়ের মাধ্যমে নকল করে দেখাচ্ছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়; অবস্থানরত বাকি সাংসদরা হাসতে হাসতে লুটোপুটি খাচ্ছেন, আর রাহুল সেই মিমিক্রির ভিডিয়ো মুঠোফোনে ধরে রাখছেন।

রাজনীতিতে ছেলেমানুষের মতো এমন ভুল রাহুল আগেও করেছেন, এখনোও করছেন। ঘৃণার বাজারে ভালোবাসার দোকান খোলার নাম করে তিনি নিজেই ঘৃণা ছড়াতে ব্যস্ত। তার প্রমাণ, জগদীপ ধনকড়ের শারীরিক অঙ্গভঙ্গির মিমিক্রির ভিডিয়ো ছড়িয়ে দিয়ে তিনি সমগ্র জাট সম্প্রদায়কে ক্ষেপিয়ে তুলেছিলেন। 'জিতনি আবাদি, উতনা হক' স্লোগান তুলে সমাজে জাতপাতের শ্রেণী বিভাজন আরও বাড়িয়ে তুলেছেন। রাহুলের এমন সব কাজকর্ম দেখেশুনে মনে হয় তিনি উলটো বলে ফেলেছিলেন। হয়তো তিনি ভালোবাসার বাজারে ঘৃণার দোকান খুলতে পথে নেমেছিলেন। জাতগণনার দাবি তুলে বিরোধীদের আকাশ-বাতাস মুখরিত করার ঘটনা দেখে মনে হয়েছিল, কবি ঠিকই হলেছিলেন, 'মানুষ নাই আজ, আছে শুধু জাত-শেয়ালের হুক্কাহুয়া।'

দৃষ্টান্ত আরও আছে। মোদী পদবিধারীদের কটাক্ষ করতে গিয়ে, তিনি সমাজের অনগ্রসর শ্রেণীকে অপমান করেছিলেন। আর বিজেপির এই অভিযোগ আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল। তাছাড়া সংসদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আলিঙ্গন করে, পরক্ষণেই চোখ টিপে অবোধ্য ইঙ্গিত করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ছেলেমানুষি তাঁর মজ্জাগত। যুক্তিতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে পরের দিন লোকসভা থেকে পালিয়ে গেলেন। তাই নরেন্দ্র মোদী ঠিকই বলেছেন, 'তুমসে না হো পায়েগা'। □

গুরু-শিষ্য

স্বামী অখণ্ডানন্দ ও শ্রীগুরুজী

তানিয়া বেরা

ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার দেশ, গুরুপরম্পরার দেশ। যুগে যুগে হাজার হাজার শিক্ষিত যুবক গুরুর সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে। মহারাষ্ট্রের এক শিক্ষিত যুবক, নাম মাধব, পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান, সদ্য প্রাণীবিদ্যায় স্নাতকোত্তর পাশ করেছে। সালটা ১৯৩১, তখনকার দিনে পাশ করলেই অধ্যাপক— হলোও তাই। কিন্তু ছাত্রাবস্থা থেকেই মনটা বড়োই অস্থির, মনকে শান্ত করার জন্য মাঝে মাঝেই রামকৃষ্ণ আশ্রমে যেতেন। সেখানে পরিচয় হয়েছিল এক ব্রহ্মচারী আনন্দ চৈতন্যের সঙ্গে, নাম অমিতাভ মহারাজ। তাঁর মাধ্যমে মিশনের প্রবীণ সন্ন্যাসী তথা তৃতীয় মঠাধ্যক্ষ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের নাম শুনেছেন।

ইতিমধ্যে যুবক মাধব (মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর) কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিলেন। নিজের মেধা ও আত্মীয়তাপূর্ণ ব্যবহারের জন্য এক বছরের মধ্যেই সবার কাছে 'গুরুজী' হিসেবে পরিচিত হলেন। সবার কাছে প্রকাশ না করলেও তাঁর মনের মধ্যে একটা অস্থিরতা ছিলই। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদ ছেড়ে দিয়ে 'চেন্নাই মৎস্য গবেষণাগারে'— কিছুদিন গবেষণার কাজ করেছেন। ফিরে এসে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি ডিগ্রিও লাভ করেন। যুবক গোলওয়ালকর নাগপুর মিশনে গিয়ে মনের শান্তি লাভ করতেন। কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে থাকার সময়েই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শাখায় আসা শুরু এবং নাগপুরে গিয়ে সঙ্ঘের আদ্য সরসঙ্ঘচালক ডাক্তারজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় জহুরির যেমন সোনা চিনতে ভুল হয় না, তেমনি ডাক্তারজীও যুবক মাধবকে সঙ্ঘের দায়িত্ব দিয়ে আপন করে নিলেন।

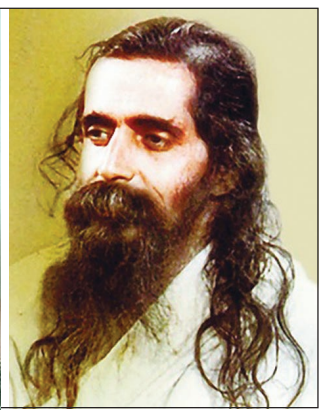

১৯৩৪ সালে মহারাষ্ট্রের আকোলাতে প্রশিক্ষণবর্গে কার্যবাহের দায়িত্ব পালন করলেন। এদিকে যুবক মাধবের মন বড়োই বিচলিত। অমিতাভ মহারাজের থেকে জানতে পেরেছেন— ঠাকুর-মা- স্বামীজীর অতি প্রিয়পাত্র, প্রচার বিমুখ এক অন্তর্মুখী সাধু 'গঙ্গাধর মহারাজ' (স্বামী অখণ্ডানন্দ) তখন পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার সারগাছি গ্রামে সেবাকাজে ব্যস্ত আছেন। যেমন ভাবা তেমনই কাজ। ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে কাউকে না জানিয়ে অমিতাভ মহারাজ ও এক মারাঠি যুবক রঘুবীর ধৌঙ্গরীকে সঙ্গে নিয়ে সোজা সারগাছি স্টেশনে নেমে ধানেরক্ষেত পেরিয়ে আশ্রমে হাজির হলেন।

সেই সময় স্বামী অখণ্ডানন্দজীর বয়স ৭২। প্রেসার, ডায়াবেটিস ইত্যাদি সমস্যায় প্রায় শয্যাগত। সারাজীবন সেবা দিয়ে এসেছেন, কারও সেবা নেননি। অনেক যুবক ভক্ত সেবা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও অনুমতি পায়নি। শেষ পর্যন্ত মাধব গোলওয়ালকরের আন্তরিক ইচ্ছায় স্বামীজী সেবা নিতে রাজি হলেন। শ্রীগুরুজীর জীবনীকার শেষাদ্রিজী লিখেছেন— Sri Guruji would daily bathe him, wash his clothes, offer him tea and meals, put him to bed. Often Sri Guruji would sit through the night at his bed-side and serve hin.' স্বামী অখণ্ডানন্দ নিজেও একটি চিঠি স্বামী নিরাময়ানন্দকে লিখেছিলেন, তাতে গোলওয়ালকরের সেবাকর্মের উল্লেখ আছে।

আজও আমরা যারা সারগাছি আশ্রম দর্শন করেছি— তারা দেখতে পাবো সেই ঘর যেখানে স্বামী অখণ্ডানন্দ থাকতেন, পাশের বারান্দাতে সেবক মাধব বিশ্রাম করতেন, পাশের পুকুরঘাটে পূজার বাসনপত্র পরিষ্কার করতেন ইত্যাদি। মাধব প্রতিদিন ভোর তিনটায় উঠতেন এবং রাত্রি ১২টা পর্যন্ত কিছু না কিছু কাজ করতেন। এত কিছুর মধ্যেও নিজের মনের বাসনা অর্থাৎ শিষ্যত্ব গ্রহণ করা বা দীক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেও কোনও উত্তর পাননি। এই ভাবে একদিন অপেক্ষার অবসান হলো। শুভদিন ১৯৩৭ সালের মকর সংক্রান্তির দিন (১৩ জানুয়ারি) দীক্ষা নেওয়ার অনুমতি পেলেন।

শিষ্যত্ব গ্রহণ করে দীর্ঘদিনের মনের বাসনা পূর্ণ হলো কিন্তু ততদিনে গুরুদেবের শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ। আরও নিবিড়ভাবে সেবা করতে থাকলেন। এবার মনের ইচ্ছা— গুরুর কাছ থেকে আদেশ নিয়ে নিজেকে আধ্যাত্মিক পথে চালিত করা এবং তার জন্য হিমালয়ের উদ্দেশে গমন করা। স্বামী অখণ্ডানন্দ নিজে যেমন অন্তরাত্মার ডাক শুনে সেবা কাজে মন দিয়েছিলেন, তেমনই প্রিয়শিষ্য মাধবকেও হিমালয়ে গিয়ে তপস্যা করার পরিবর্তে নাগপুরে ফিরে গিয়ে সামাজিক কাজের দায়িত্ব নিতে বললেন। একমাসের মধ্যেই স্বামী অখণ্ডানন্দজী (ফেব্রুয়ারি মাসে) দেহ রক্ষা করলেন এবং মাধব গোলওয়ালকর নাগপুরে প্রাতঃস্মরণীয় ডাক্তারজীর কাছে গিয়ে নিজেকে সমর্পণ করলেন। □

চরম অপরাধী ও দেশদ্রোহীরাও এবার লোকসভায় নির্বাচিত

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গণতন্ত্র রক্ষার অন্যতম হাতিয়ার হলো সাধারণ নির্বাচন। যে প্রক্রিয়ায় দেশের সাধারণ মানুষ তাদের ভোট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সঠিক ব্যক্তি অথবা সরকার নির্বাচন করেন। কিন্তু এবার প্রশ্ন উঠেছে, ভোট দিয়ে যে ব্যক্তি বা সরকার নির্বাচন করা হয় তা কী ভেবে চিন্তে করা হয়! কারণ গত লোকসভা নির্বাচনে এমন কিছু ব্যক্তিকে ভোটে জিতিয়ে পার্লামেন্টে পাঠানো হয়েছে তারা অপরাধ ও দেশবিরোধী অভিযোগে অভিযুক্ত। এবারের নির্বাচনে বেশ কয়েকটি রাজ্য থেকে এমন কয়েকজন প্রার্থী নির্বাচনে জয়ী হয়ে পার্লামেন্টে শপথ নিয়েছে, তারা সরাসরি অপরাধ ও দেশদ্রোহিতার অভিযোগে জেলবন্দি। তারা বন্দি অবস্থায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে এবং দেশের মানুষ তাদের ভোট দিয়ে জিতিয়ে সংসদে পাঠিয়েছে। এবারের নির্বাচনে বিহার, ইউপি থেকে এমনই বেশ কিছু বাহুবলী নির্বাচনে জিতে পার্লামেন্টে সদস্য হয়েছে।

অমৃতপাল সিংহ

আবদুল রসিদ

এমনই দু'জন প্রার্থী যারা জেলবন্দি অবস্থায় নির্বাচনে জিতে সাংসদ হয়ে পার্লামেন্টে শপথবাক্য পাঠ করেছে। এই দুজনেই যারা দেশের আইনকে মানে না। সংবিধান মানে না এমনকী ভারতকে নিজের দেশ হিসেবে মনে করে না। অপরাধ ও দেশাদ্রোহিতার অপরাধে তারা এখনও জেলবন্দি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো এই দু'জনেই জেল থেকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বিপুল ভোটে তাদের নিকটতম প্রার্থীদের হারিয়ে দিয়ে প্যারোলে জামিন পেয়ে পার্লামেন্টে শপথ বাক্যপাঠ করেছে। এই দুই সাংসদের মধ্যে একজন পঞ্জাবের অমৃতপাল সিংহ।

তার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতা-সহ একাধিক মামলা রয়েছে। বর্তমানে সে বিচারাধীন বন্দি। সে জেল বন্দি অবস্থায় পঞ্জাবের খাদুরশাহি থেকে নির্দল প্রার্থী হয়ে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কুলবীর সিংহ জিরাকে বহু ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছে, অথচ এই অমৃতপালের নামে একাধিক অপরাধমূলক অভিযোগ রয়েছে। সে বিচ্ছিন্নতাবাদী ওয়ারিস পঞ্জাব সংগঠনের নেতা। অমৃত পাল ২০২৩ সালের ২৩ এপ্রিল স্বাধীন পঞ্জাবের দাবিতে থানায় হামলা চালায়। সেই অপরাধে তাকে গ্রেপ্তার করে তিহার জেলে পাঠানো হয়।

অন্যদিকে, অন্য এক জেলবন্দি জম্মু-কাশ্মীরের আবদুল রসিদ ওরফে ইঞ্জিনিয়ার রসিদ। সে জম্মু বিধান সভার এক সময় সদস্য ছিল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সে জঙ্গি সংগঠনগুলিকে অর্থ জোগান করত এবং আজাদ কাশ্মীরের ডাক দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, বিধানসভা সদস্য থাকাকালে সে বিধান সভার মধ্যেই গোমাংস ভক্ষণ করেছিল এবং উদমপুরে এক ট্রাক চালককে পিটিয়ে হত্যা করেছিল। সেই অপরাধে সে বর্তমানে জেলবন্দি। অথচ জেল বন্দি অবস্থায় তিনি জম্মু-কাশ্মীরের বারামুলা কেন্দ্র থেকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করে এবং তার বিরোধী হেবিওয়েট প্রার্থী ন্যাশানাল কনফারেন্সের নেতা এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাকে লক্ষাধিক ভোটে পরাজিত করে।

বন্দি এই দু'জনকেই প্যারোলে জামিন দিয়ে পুলিশি প্রহরায় পার্লামেন্টে শপথ বাক্যপাঠ করানো হয়। প্রশ্ন উঠছে, দেশের সাধারণ মানুষ সত্যিই কি সঠিক ভাবনা চিন্তার মধ্য দিয়ে প্রার্থী নির্বাচন করে? এটা বোধহয় ভেবে দেখার সময় এসেছে।

হাথরসে শতাধিক মানুষের মৃত্যু, শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গত ২ জুলাই উত্তরপ্রদেশের হাথরসে 'ভোলে বাবা সৎসঙ্গ' নামে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গিয়ে পদপিষ্ট হয়ে ১২১ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে বেশিরভাগ মহিলা ও শিশু। সৎসঙ্গ অনুষ্ঠানটির আয়োজক ছিল এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত— দেবপ্রকাশ মধুকর। গত ৫ জুলাই উত্তরপ্রদেশ পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। এই সৎসঙ্গ অনুষ্ঠানের মূল মাথা হলো সূরজপাল সিংহ যিনি একজন স্বঘোষিত ধর্মগুরু। তিনি নিজেকে ভোলে বাবা ও নারায়ণ সাকার হরি নামে পরিচয় দিতেন। অনুষ্ঠানস্থল থেকে বেরোনোর রাস্তাটি ছিল অত্যন্ত ছোটো ও সংকীর্ণ। তাছাড়াও অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশ ও বেরিয়ে আসার জন্য ড্রেনের উপর একটি অস্থায়ী কাঠামো তৈরি করা হয়েছিল। এই সৎসঙ্গে লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয়। অনুষ্ঠান শেষে প্রচুর সংখ্যক মানুষ একসঙ্গে বেরিয়ে আসতেই সেই কাঠামোটি ভেঙে পড়ে। হুড়োহুড়ির মধ্যে পদপিষ্টের ঘটনা ঘটে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লোকসভায় বক্তব্য রাখার সময় এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেন। তিনি উত্তরপ্রদেশ সরকারকে সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। মৃতদের দু'লক্ষ, আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করেছে উত্তরপ্রদেশ সরকার। ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

ধর্মান্তরণ বন্ধ না হলে দেশের সংখ্যাগুরু হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে যাবে, পর্যবেক্ষণ এলাহাবাদ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ধর্মান্তরণের ক্ষেত্রে সমাজের পিছিয়ে পড়া এসসি-এসটি সম্প্রদায়ভুক্ত গরিব মানুষ হলো মূল লক্ষ্যবস্তু। ধর্মান্তরণ বন্ধ না হলে একদিন ভারতে সংখ্যাগুরু হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে যাবে। দেশ জুড়ে ক্রমবর্ধমান ধর্মান্তরণের ঘটনা নিয়ে সম্প্রতি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এলাহাবাদ হাইকোর্ট। আদালত বলেছে এই জিনিস চলতে থাকলে দেশে সংখ্যাগুরু হিন্দুসমাজ একদিন সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি রোহিতরঞ্জন আগরওয়াল— কৈলাস নামে এক ব্যক্তির জামিনের আবেদন খারিজ করে এই মন্তব্য করেন। কৈলাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সে গ্রামের একদল হিন্দুকে খ্রিস্ট মতে দীক্ষিত করেছে। এই বিষয়ে আদালতের পর্যবেক্ষণ হলো, এই প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে দেওয়া হলে দেশের একদিন সংখ্যাগুরুরাই একদিন সংখ্যালঘু হয়ে যাবে। এই ধরনের ধর্মান্তরণ এই মুহূর্তে বন্ধ হওয়া উচিত।

ধর্মীয় সমাবেশে ধর্মান্তরিত করার কাজ অবিলম্বে নিষিদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে উচ্চ আদালত। স্পষ্ট ভাষায় আদালত জানিয়েছে যে সংবিধানের ২৫ নম্বর ধারা মোতাবেক ধর্মাচরণের অধিকার লঙ্ঘন করে ধর্মান্তরণের এই কাজ। সংবিধানে স্বাধীন ধর্মাচরণের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। কোনো ব্যক্তি যে কোনো মত-পথের অনুগামী হতে পারেন বা সেই পথে সাধনা-ভজনা করতে পারেন। এমনকী শর্তসাপেক্ষভাবে নিজ মত প্রচার করতে পারেন।

হাইকোর্ট স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে— ধর্ম প্রচারের অর্থ হচ্ছে নিজের ধর্মকে অন্যের ধর্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া। কিন্তু অন্য কাউকে নিজের ধর্মে ধর্মান্তরিত করা নয়। আদালতের মতে মানুষের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে নানা প্রলোভনে উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন গ্রামে হিন্দুদের খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করার কাজ চলছে।

হামিদপুর জেলায় মৌদহ গ্রামে কৈলাসের বিরুদ্ধে ধর্মান্তরিত করার অভিযোগকে গুরুতর অভিযোগ বলে বর্ণনা করেছেন বিচারপতি আগরওয়াল। রামকলি প্রজাপতি নামে এক ব্যক্তি কৈলাসের বিরুদ্ধে ধর্মান্তরিত করার অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। কৈলাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত খ্রিস্টানদের একটি সভায় গ্রামের সকলকে সে নিয়ে যায় এবং সেখানে তাদেরকে খ্রিস্ট মতে দীক্ষিত করা হয়। এফআইআর অনুসারে প্রজাপতির মানসিকভাবে অসুস্থ ভাইকেও টাকা পয়সা দিয়ে ধর্মান্তরিত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। উত্তরপ্রদেশ প্রোহিবিশন অফ আনল'ফুল কনভার্শন অফ রিলিজিয়ন অ্যাক্ট, ২০২১ অনুযায়ী ধর্মান্তরণের এই ঘটনাকে আদালত অসাংবিধানিক ও অবৈধ আখ্যা দিয়েছে ও অভিযুক্তের জামিনের আবেদন খারিজ করেছে।

শোক সংবাদ

মালদা জেলার গাজোলের প্রবীণ স্বয়ংসেবক কালাচাঁদ কুণ্ডু গত ৮ জুলাই

পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ পুত্র, ৩ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গিয়েছেন। তিনি গাজোলের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ছিলেন। জনসঙ্ঘের সময় থেকেই তিনি রাজনীতিতে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। গাজোল সরস্বতী শিশুমন্দিরের সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছেন।

ইংল্যান্ড থেকে ১০০ টন সোনা দেশে ফেরালো রিজার্ভ ব্যাংক

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ৩১ মে বিভিন্ন সংবাদসংস্থা সূত্রে খবর যে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই) সম্প্রতি একটি ব্যতিক্রমী কাজ সম্পন্ন করেছে। ১৯৯১ সালের পর এই প্রথম বার ইংল্যান্ড থেকে ১০০ টনের কিছু বেশি পরিমাণ সোনা ভারতে ফিরিয়ে এনেছে আরবিআই। আরবিআইতে গচ্ছিত সোনার একটি অংশ থাকে ভারতে, বাকি অংশ অন্য দেশগুলিতে রাখা হয়ে থাকে। লজিস্টিক কারণে ও 'ডাইভার্সিফায়েড স্টোরেজ'-এর উদ্দেশ্যে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে ফের সমপরিমাণ সোনা ভারতে ফিরতে পারে বলেও সংবাদসংস্থা সূত্রে খবর। সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, এই বছরের মার্চ মাসের শেষে আরবিআইতে রক্ষিত আছে মোট ৮২২.১ টন সোনা, যার মধ্যে ৪১৩.৮ টন সোনা বিদেশে রয়েছে। শেষ আর্থিক বছরে ২৭.৫ টন সোনা কিনেছে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক যার ফলে ভারতীয় স্বর্ণভাণ্ডার সমৃদ্ধতর হয়েছে।

বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলির মধ্যে ভারতের সোনা সংরক্ষণের স্টোরহাউজ হিসেবে পরিচিত হলো--- 'ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড'। স্বাধীনতার অনেক আগে থেকেই সমুদ্রপারে সোনা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এই প্রথা অনুসৃত হয়ে এসেছে। গত কয়েক বছরে আরবিআই সোনা কিনতে শুরু করেছে। যার ফলে সোনা সংরক্ষণের স্থান নির্বাচনের বিষয়টি আরবিআই পর্যালোচনা করতে থাকে। বিদেশে মজুত সোনার পরিমাণ অনেকটাই বেড়ে যাওয়ায় সোনার সেই অতিরিক্ত স্টকের একটি অংশ ভারতে আনার সিদ্ধান্ত নেয় আরবিআই।

ভারতীয়দের কাছে সোনা একটি মূল্যবান ধাতু। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দেশবাসীর অনুভূতি ও আবেগ। ১৯৯১ সালে ব্যালেন্স অফ পেমেন্টের সংকট সামলাতে দেশের সোনা বন্ধক রাখতে বাধ্য হন ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখর। ১৫ বছর আগে ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ড (আইএমএফ) থেকে ২০০ টন সোনা কেনে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক। এইভাবে ধীরে ধীরে সোনা ক্রয়ের মাধ্যমে রিজার্ভ ব্যাংকের গোল্ড স্টক বা মজুত সোনার পরিমাণ সম্প্রতি অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯১-এর বিপ্রতীপে ভারতীয় অর্থনীতির এই অগ্রগতি সত্যিই উন্নতি ও আর্থিক সাফল্যের নিদর্শন।

গত মার্চের শেষে বিদেশে মজুত সোনার এক-চতুর্থাংশ ভারতে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া একটি 'ম্যাসিভ লজিস্টিকাল এক্সারসাইজ'। এর পিছনে রয়েছে বিগত অনেক মাসের দীর্ঘ পরিকল্পনা এবং তার নিখুঁত বাস্তবায়ন। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে অর্থ মন্ত্রক, আরবিআই এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য অনেকগুলি দপ্তর ও আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের অসাধারণ সমন্বয়। যে জাহাজটিতে চাপিয়ে এই সোনা ভারতে ফেরানো হবে, সেই জাহাজটির কাস্টমস্ ডিউটি মকুবের ব্যবস্থা করে আরবিআই। কেন্দ্র এই কাস্টমস্ ডিউটি মকুব করে দেয়। যদিও এই ক্ষেত্রে আমদানির ওপর প্রযুক্ত কর ইন্টিগ্রেটেড জিএসটি (আই-জিএসটি) প্রদানে ছাড় পায়নি আরবিআই। জাহাজ ছাড়াও একটি স্পেশাল এয়ারক্রাফট বা বিশেষ বিমানে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা-সহ এই বিপুল পরিমাণ সোনা পরিবহণের ব্যবস্থা করা হয়। দেশের সোনা দেশে ফিরিয়ে আনা সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডকে আরবিআইয়ের তরফে প্রদেয় স্টোরেজ কস্ট বাবদ অর্থ সঞ্চয়ে সহায়ক হয়েছে ভারত সরকারের এই সকল পদক্ষেপ। বিদেশ থেকে ভারতে ফেরানো এই সোনা নাগপুরে এবং মুম্বইয়ের মিন্ট রোড-স্থিত আরবিআইয়ের ওল্ড (পুরনো) অফিস বিল্ডিঙের ভল্টে সংরক্ষিত রাখা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। □